বড়দের হাসিখুসি

এই লেখকের লেখা

অনেকরকম (যন্ত্রস্থ)

শিবরামের সেরা গল্প

আপনি কী হারাইতেছেন

জানেন না !

পাত্রপাত্রী-সংবাদ

হারাণো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

মেয়েদের মন

প্রেমের প্রথম ভাগ

প্রেমের দ্বিতীয় ভাগ

আমার লেখা

ইত্যাদি

বড়দের হাসিখুসি

শিবরাম চক্রবর্ত্তী বিরচিত
ও
রেবতীভূষণ ঘোষ বিচিত্রিত

প্রকাশক :
শ্রীসরোজনাথ সরকার, এম্‌-এ., বি-এল্‌.
কমলা বুক ডিপো
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট্‌,
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন—১৩৫৮
দাম : তিন টাকা মাত্র
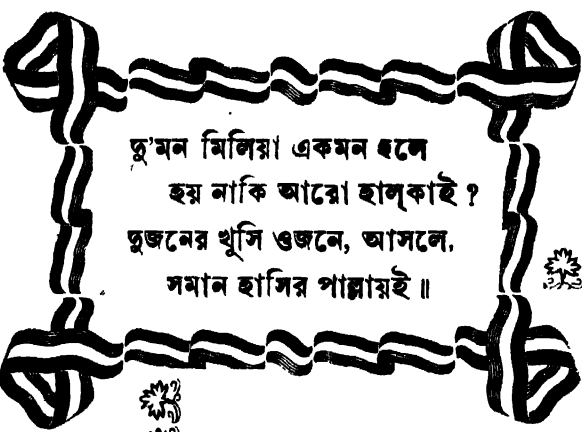
মুদ্রক :
শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস
শ্রীপতি প্রেস
১৪, ডি, এল্‌, রায় ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

দু'মন মিলিয়া একমন হলে
হয় নাকি আরো হাল্‌কাই ?
দুজনের খুসি ওজনে, আসলে,
সমান হাসির পাল্লায়ই ॥
উপহার

[এক]

অই অজগর আসছে তেড়ে

মনের মত মেয়ে পাওয়াই এক দুর্ঘট, তারপর যদিই বা মিললো, সেই মেয়ের ফের যদি মেয়ের মত মন না হয় তাহলে আবার আরেক দুর্ঘটনা।

যখনই মায়ার কাছে মনের কথা পাড়তে যাই, বাধা পাই তখনই।—'ও কথা থাক্। এখন থাক্।' শুনতে হয় খালি।

প্রেমের কথার আবার এখন তখন আছে নাকি? লোকে কি পাঁজি পুঁথি দেখে তারপরে ভালোবাসায় পড়ে?

অবশেষে একদিন সে বললে—পূজোয় আমরা নৈনিতাল যাচ্ছি তো। তুমিও এসো না কেন বেড়াতে? কলকাতায় কি আর মন খুলে কথা কওয়া যায়?

কিছুতেই তাল পাই না। তবু যাহোক্, শেষ পর্যন্ত নৈনিতাল পেলাম।

আমি অবশ্যি বলেছিলাম—'নৈনিতাল কেন? মনে যদি আমেজ আসে তাহলে কলকাতাকেই তো কাশ্মীর বানানো যায়। তুমি পাশে থাকলে সব জায়গাই আমার কাছে ভূস্বর্গ। তুমি বেহাতে গেলে সব ভেস্তে গেল। বিসর্গ হয়ে আমার বেহেস্ত গেল।'

'তাহলে কি তুমি বলছো দেরাদুনই ভালো হবে?' মায়া বলেছে।

কাউকে যদি একটু সাধা যায় অমনি তার ল্যাজ মোটা হয়ে দেড়া কি দুনো হয়ে ওঠে—দুনিয়ার হাওয়াই এই! একটু

দক্ষিণে দিলেই পৃথিবী অম্‌নি ফুলে ফুলে তার উত্তর দিতে থাকে।

মায়া ঝান্‌সীবাহিনীর মেয়ে। যুবতী। এবং বেশ যোয়ান্‌। কিন্তু দেহে শক্তি ধরলেই যে মনকেও শক্ত করতে হবে তার কোনো মানে আছে? সুলভ নারী নাই বা হোলো, কিন্তু নারীসুলভ যাকিছু তার কিছু কি থাকতে নেই?

তাহলেও মেয়েলি কিছু ছিলো বুঝি মায়ার। অন্ততঃ, কথা রাখার ব্যাপারে।

মেয়েদের কথার ঠিক—বলতে গেলে প্রায় ঠিক ছেলেদের মতই। বালি যাবো বলে বেরুলে ছেলেরা বালিগঞ্জে যায়, আর মেয়েরা বেলুড় যাবো বললে বোধহয় উড়তেই বেরোয়। বেলুনেই চাপে হয়তো।

অতএব, নৈনিতাল যেতে মায়ারা আলমোড়া গেল।

আর আমি? আমার কথা বলাই বাহুল্য—! যেখানে মায়া, মায়াবাদীরা সেইখানেই। মায়াজড়িত না হয়ে তারা থাকতে পারে না।

মহামায়ার এম্‌নিই লীলা!

'এধার দিয়েই যাত্রীরা মানস সরোবরে যায়। এই আলমোড়া দিয়েই যাবার পথ, তা জানো?" মায়া শুধোয় আমায়।

আমি জানতাম না। ভূগোল আমার কাছে মায়ার মতই গোলমেলে। তার ম্যাপ আর আমার মনের মাপে একেবারেই খাপ খায় না।

'তুমি মনের কথা কী বলবে বলছিলে না? তাই এই মানস সরোবরের পথে নিয়ে এলাম তোমায়।' ও জানালো।

মনের কথা আমার মনেই থাকে, কেমন খট্‌কা লাগে, এটা—অ্যাঁ, মহাপ্রস্থানের পথও কি নয় তাহলে? এই দিক দিয়েই একদিন যুধিষ্ঠির ভীম এট্‌সেট্‌রা মহাপ্রয়ানের পথে এগিয়েছিলেন না? এট্‌সেট্‌রা মানে, পাণ্ডবদের সেটে ঠিক না হলেও, প্রবোধ সান্ন্যাল প্রমুখ আমার কোনো কোনো বন্ধু ঐ পথেই গেছলেন বলে শোনা যায়। তবে যদ্দূর জানি, তাঁরা সশরীরে ফেরৎ এসেচেন।

কিন্তু তাঁরা এলেও আমি কি আর ফিরতে পারবো? আমাদের মত নশ্বর জীবের মনের কথার শেষে, বিয়ে কিম্বা ইলোপমেণ্ট একটা কিছু ঘটবেই,—আর উক্ত বিলোপের কথা ধরলে তা মহাপ্রস্থান ছাড়া কী আর? আর ধরুন, যদি বা অবশেষে প্রত্যাখ্যানই জোটে, সেও তো একরকমের মহাপ্রস্থানই বলতে হয়! মানস সরোবরে না গিয়েও মনের sorrow বাড়ন্ত করে যদি দেখি তাহলে কোনোদিক দিয়েই কিছু প্রবোধ মেলে না।

মায়া বল্লো: 'কালকে তুমিই এসো আমাদের হোটেলে, কেমন? সকালেই এসো, বেড়াতে যাওয়া যাবে কাল। তৈরী হয়ে থাকবো আমি। বেরিয়ে পড়বো—তুমি এলেই।'

সকালে আমার হোটেলের জলখাবার খেয়েই বেরুলাম। গিয়ে দেখি, মায়া তাদের বাড়ির গেটের কাছে দাঁড়িয়ে। সাদা উলের পুলওভার ওর গায়ে—বরফের মতই ধবধবে। শাড়ির বদলে পরেছে স্কার্ট। এমন মানিয়েছিল! আর, ওর অনাবৃত ঐ পা। আজানুলম্বিত অমন শ্রীচরণ! নিছক্ লেগ্‌সাম্ মেয়েও কিছু কম হ্যাণ্ডসাম্ হয় না আমি ভেবে দেখলাম। এবং দেখে দেখে আরো ভাবলাম। সত্যি বলতে,

বিলিতি মেয়েদের মতই সুশ্রী—সুগঠিত—সুষমাময়! দেখলে চোখ জুড়োয়—মনে হয় যেন বুকের ওপর দিয়েই হাঁটছে!

পেল্লায় এক 'ভ্রমণথলি' নিয়েছে সঙ্গে। তাই দেখে তাক্ লাগলো আরো। সত্যিই কি মহাপ্রস্থানের পথে যাবার মৎলব নাকি ওর? পায়ে ভারী ভারী বুট—আমি লক্ষ্য করলাম।

'কী আছে ওতে?' থলির দিকে তাকিয়ে আমি শুধাই।

'দড়ি।'

'দড়ি! দড়ি কেন?'

'গলায় দেবার জন্যে। কেন আবার?'

'বিস্কুটের টিন্, থার্মফ্লাস্ক্—এসবও যেন দেখছি?" আমি উঁকি মারি থলির ভেতর।

'স্যাণ্ডউইচও আছে। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক্।'

বেরিয়ে পড়া গেল। ওর হাতের বোঝা আমার হাতে দিতে বল্লাম। ঘাড় নাড়লো ও—'আমার ভার তুমি কেন বইবে বলো তো? আমি কি অবলা? আমি কি 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব'? নিজের বোঝা নিজে বইতে পারি নে?"

একটু তো বেড়ানো তার জন্যে এত বড়ো থলে কেন? অবাক লাগে। কিন্তু ঐ একটিই নাকি ছিলো ওর। এটা-ওটা টুকি-টাকি—পথে-ঘাটে চলতে-ফিরতে কখন কিসের দরকার পড়ে! পা কেটে গেলেও তো আইডিন চাই। তার সবই নাকি রয়েছে ওর মধ্যে। খাবার-দাবারও।

খাবারের কথায় আমার খিদে পেয়ে যায়। আধঘণ্টা হাঁটবার পর আমি বলি—'এসো, এবার বসা যাক এখন। চেখে দেখি তোমার দু একখানা স্যাণ্ডউইচ।'

'এখনি? এর মধ্যেই কাহিল হয়ে পড়লে?' মায়া খিল খিল করে ওঠে।

'আমার কথা বলছিনে—তোমার জন্যেই।' আমি বলি। 'অনেকটা তো হাঁটা হোলো, এবার তোমারো একটু বিশ্রাম করা দরকার নয় কি?'

'বিশ্রাম?' কথাটা ও হেসেই উড়িয়ে দেয়—'সারাদিন আমি হাঁটতে পারি এমনি, ঘুরে ঘুরে বেড়াতে অ্যাতো ভালো লাগে আমার।'

আমিও হাসি কথাটায়। কথাটা যেন ভয়ঙ্কর হাসির। এবং আরো ঘণ্টা দুই আমরা হাঁটি। তারপর—

তারপর—ঘণ্টা দুয়েক হাঁটবার পর—মায়া ফিরে তাকায়। পিছন ফিরে তাকায় আমার দিকে।

বলা বাহুল্য, আমি ঢের পিছিয়ে পড়েছিলাম তখন।

'এইবার একটু রেস্ট্ নেয়া যেতে পারে, কী বলো?' হেঁকে বললো মায়া—'কিছু খেয়েও নেয়া যাক, কেমন?'

শোনবামাত্র আর আমি এগুইনা। যেখানে ছিলাম, ল্যাংবোটের ভূমিকা ত্যাগ করে বসে পড়ি সেইখানেই। একা রামে রক্ষে নেই—! রেস্ট্ এবং রেস্তোরাঁ—একসঙ্গে। রামের ওপরে আরাম! তারপরে আর কোন্ হতভাগা এক পা এগোয়?

মায়াকেই পিছিয়ে আসতে হয়। হাসতে হাসতে সে আসে। এসে বসে আমার পাশে। খোলে তার থলে। বার করে পাউরুটি, স্যাণ্ডউইচ, কেক, ট্রফি, চকোলেট। স্যালাড আর পুডিং। থার্মোফ্লাস্ক্—তার ভেতরের তপ্ত কফি।

জুতো খুলে পায়ে হাওয়া লাগাই! ফোস্কা পড়ে গেছল গোড়ালিতে। পা ছড়িয়ে হাত বাড়াই স্যাণ্ডউইচের দিকে।

যদিও পায়ের দরদ কম নয় তবু এতক্ষণ বাদে মায়াকে পাশে পেয়ে মনের ব্যথা জুড়োয়।

তাকাই ওর মুখের দিকে। হাঁটার শ্রমে এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে! সুরু করবো নাকি আমার মনের কথাটা?

সেযুগের উপন্যাস প্রকৃতি-বর্ণনা দিয়ে আরম্ভ হোতো, আমিও সেইভাবেই সুরু করি। আর, সত্যি বলতে, প্রেম, যতই আধুনিক হোক না, এখনো সেই উপকথার যুগেই রয়ে গেছে।

চারিধারের দৃশ্য-সৌন্দর্যের সুচারু বিবরণ দিয়ে শেষে ওর রূপবর্ণনায় এলাম—এলোমেলো চুলগুলো আস্তে আস্তে ওর মুখের থেকে সরিয়ে নরম হাতটা নিলাম নিজের মুঠোয় - আর—গরম কফির সঙ্গে ওর হাতেও একটা চুমুক দিয়ে—'মায়া, তোমার মত এমন অপরূপ মেয়ে আমি আর দেখিনি—'

সুরু করেছি মাত্র—প্রেমের কথা চিরকালই রূপ-কথা। উপকথাও। বর্ণে বর্ণে যদি বা মেলে অক্ষরে অক্ষরে মেলে না।

নিজের থলি গুটিয়ে মায়া উঠে দাঁড়ায়।—'নাও, জুতো পরে নাও, চলো।'

'এক্ষুনি? এত শীগগির?' কথার মাঝখানে অন্য কথায় আমি বিচলিত হই। আমার ক্ষুণ্ণ কণ্ঠ শোনা যায়।

কিন্তু শুনছে কে!

'এই একটুখানি হেঁটেই থকে গেলে? একেবারেই বসে পড়লে? ভারী কুড়ে তো তুমি! এখন কি বসে বসে গল্প করে নষ্ট করার সময়?'

'মায়া, ভালোবাসার মানে কি সময় বাজে নষ্ট করা?' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে আমি বলতে যাই, কিন্তু মায়া ততক্ষণে বিশ গজ এগিয়ে গেছে। ঘাড় ফিরিয়ে সে বলে—'ঐ যে ছোট্ট পাহাড়টা দেখছো, চলো, আগে ওর চূড়ায় উঠিগে। তারপরে—তারপর সেখানে তোমার সব কথা শোনা যাবে। আমাদের ভালোবাসার

আলোচনা করা যাবে তখন। রোমান্সের চূড়ান্ত করা যাবে না হয়।'

মায়া আর দাঁড়ায় না, নিজেকে বাড়ায়। আমি খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলি—ওর পেছনে পেছনে।

পাহাড় সম্বন্ধে এতাবৎ আমার যা ধারণা ছিল, দেখা গেল তা অমূলক। চোখে দেখে তাদের যতোটা কাছাকাছি ভাবা যায়—তারা মোটেই তা নয়। যতই এগোও, মরীচিকার মত, মায়ার মতই, আরো যেন এগিয়ে যাচ্ছে। পিছিয়ে যাচ্ছে আরো। আর যতটা ছোটখাটো ভাবো—তাও নয়! ম্যাপের পাহাড় দেখে পাহাড়ের পরিমাপ করা যায় না। পর্বত সম্বন্ধে হ্রস্বদীর্ঘ-জ্ঞান না থাকা নিতান্ত শোচনীয়। দারুণ পরিতাপের। পায়ের হাড় আস্ত নিয়ে পাহাড়ে যাওয়া, বা সেখান থেকে ফেরৎ আসা, আর যাহার হোক্, আমার পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার।

ঝাড়া আড়াই ঘণ্টা হাঁটার পর সেই মায়াপাহাড়ের তলায় আমরা পৌঁছলাম।

মায়া থামলো। পাহাড়তলি পার হয়ে। আর নামালো তার ভ্রমণথলি।

স্যাণ্ডউইচের আশায় আমি একটু উল্লসিত হয়েছি। কিন্তু না, ভ্রম। রজ্জুতে সর্পভ্রম!

ব্যাগের ভেতর থেকে সে বার করলো এক গাছা মোটাদড়া। সাপ নয়, রজ্জুই— আমি চোখ রগড়ে দেখলাম ভালো করে।

আমার বিস্ময় নিঃশেষ হবার আগেই সে দড়ার একটা দিক আমার কোমরের সঙ্গে বাঁধলো—বেশ কড়া করে—অন্যধারটা জড়ালো তার নিজের কটিতে।

তারপর সে তাকালো পাহাড়ের দিকে।

আমিও তাকালাম। কিন্তু তাকিয়ে তার কূল-কিনারা কী পাবো? পাহাড়কে কোনো কালেই চেনা যায় না, চিনতে গেলে চিহ্ন থাকে না পরিচয়-প্রার্থীর। সামনেই রয়েছে পঞ্চপাণ্ডব এট্‌সেট্‌রার—সঙ্গী কুকুরটিকে ধরে—সমুজ্জ্বল ছটি দৃষ্টান্ত! সেই উদাহরণের ছটা সামনে রেখে আর এই পাহাড়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমার বুক গুড় গুড় করে। হাত পা কাঁপে। বিল্‌কুল্ গায় কুল্‌কুল্ করে বাণ ডাকে।

'আমি বারতিনেক দড়ি ধরে নাড়া দেব—টান্ পেলেই তারপর তুমি আমায় ফলো করবে, কেমন?' মায়া পাহাড়ের গায়ে পা রাখে।

সামনের এই খাড়াই আর কোমরের এই দড়া—আমার এমন খারাপ লাগে! ঝুঁকি নেব কিনা ভাবচি, ইতিমধ্যে তিনটে ঝাঁকি পাই! তারপর, ভালো করে টের পেতে না পেতেই, মুটেরা যেমন করে ঝাঁকা তোলে, ঠিক তেম্‌নি করেই মায়া, আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেই অসহায় আমায় টেনে নেয় এক হ্যাঁচকায় —আর আমি তার উচ্চাটনে একেবারে পাহাড়ের কিনারায় গিয়ে পড়ি।

পাথরের খোঁচখাঁচ সামলে খাড়াইএর গা বেয়ে উঠবার চেষ্টা করি—পারাই যায় না! পা-ই রাখা দায়, দাঁড়ানোই মুস্কিল! খাড়া হবার জায়গা নেই কোথ্‌থাও, পারবো কি!

আমার পদস্খলন হয়—পদে পদে। হবেই, জানা কথা। মেয়েরা চিরদিনই ছেলেদের পদস্খলনের হেতু। পা হড়কে

যায় আমার—বারম্বার, কিন্তু আমি পড়িনে। ঝুলতে থাকি ত্রিশূণ্যে। কোমরের শক্ত দড়া আমাকে টানতে থাকে ওপরে। আমার পড়া হয় না, পড়ি পড়ি করেও উপনীত হই—উঠতে থাকি ঊর্দ্ধে। মিস্-কোটেশনের মত উদ্ধৃত হতে থাকি।

সাতটা খাড়া পাথরের চাঙার পার হই পরম্পরায়। এই করেই। সাত সাতবার আমি পড়ো পড়ো হই। আমার দম বন্ধ হয়ে আসে, অন্ধকার দেখি, কান ভোঁ ভোঁ করে। সাতবারই প্রাণপণে সেই পেল্লায় চাঙার বেয়ে উঠতে যাই, উঠতে চাই, আর আমার হাত-পা ফস্‌কায়। সাত সাতবার ঝোঝুল্যমান আমি আমার নিজভারে পাহাড়ের তলায় পড়ে ছাতু হয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হই। ধরাতলে অবতীর্ণ হবার অপেক্ষায় থাকি। আর মায়া আমায় ছেঁচরে তোলে। আমার অবতারণা আর হয় না। জামা কাপড় ছিঁড়ে যায়, সারা গা ছড়ে যায়—আমি কোথায় যাই জানিনে!

এমনি করে মায়ার দুর্নিবার আকর্ষণে আমি উঠি। এই ঝাড়া দশ ষ্টোন্ বারো পাউণ্ডকে খাড়া অতগুলি ষ্টোনের ওপর দিয়ে সে যে কি করে টেনে তোলে—একলা—কারো সাহায্য না নিয়েই—সে-ই এক রহস্য! কোন্ কৌশলে এই অসাধ্য-সাধন করে, ভেবে পাই না।

পরিশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত উৎপাটিত আমি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে—পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উত্তীর্ণ হই। পর্যবসিত হই—চূড়ান্তে গিয়ে। মায়া আমার পিঠ চাপড়ে সাধুবাদ দেয়—'বাঃ, বেশ শক্ত ছেলে! বাহাদুর বলতে হয় তোমায়। সাবাস্!'

আবার আমি পা ছড়াই। আবার ওর পুঁজি পাটা ছড়িয়ে পড়ে। পুঞ্জীভূত স্যাণ্ডউইচ ইত্যাদিরা বেরোয়। মায়ার মুখ ফোটে ফের—'হ্যাঁ, কী বল্‌ছিলে না তুমি? মনের কথা কী

বলছিলে যে তখন? ভালোবাসার কথা কী যেন বলতে চাইছিলে?'

আমি কিছু ব'লি না। যা বলবার আমার ফুস্‌ফুস্‌রাই বলে। ফিস্ ফিস্ করে নয়—হাঁস ফাঁস করেই। ঘন ঘন আমার নিশ্বাস পড়ে। দীর্ঘনিশ্বাস নয়।

'শোনাও তোমার মনের কথা বন্ধু—!' মায়ার অনুরোধ শুনি। ঠাট্টার সুর নয়, মনের ছন্দই বুঝি বাজে ওর আওয়াজে, কিন্তু আমি—শ্রীমান্ অমুক চন্দ্র তমুক—এই এত কথার চুপ্‌রি—তখন একেবারে মূক। বেবাক্ চুপ!

কইতে চেষ্টা করিনি যে তা নয়, কিন্তু কথাটা আমার গোঙানির মত শোনাতেই চেপে গেছি।

অবশেষে ও ছোট্ট একটু নিশ্বাস ফেলে বল্লে—'চলো, এবার তাহলে ওঠা যাক্। ফেরা যাক্ তাহলে।'

ফিরলাম আমরা। সারাপথ আমি নীরব। মায়াই যা বক্‌ছিল। কিন্তু আমার কোনো হু হাঁ ছিল না।

কথার তুবড়ি—আমার পেটে ডুব মারলেও একটা কথার খই মেলে না তখন। খেই মেলে না মনের। বোবা মেরে গেছি আমি!

কী বলবো? মনের sorrow আমার বড়ো হয়ে উঠেছে তখন! আমার মন থই থই করছে মনের দুঃখে। টল্ টল্ করছে মানস সরোবরের মতই—টই টম্বুর!

আর, মানস সরোবরে যাবার পথ এই ধার দিয়েই ছিল না?

হোটেলে ফিরে আমাদের ম্যানেজারকে বলে দিই, আমার খাবার-দাবার শোবার ঘরে পাঠাতে—যতোদিন না আমি খেতে নামছি নীচেয়। আর বলে দিই কেউ যেন আমায় বিরক্ত না

করে। কেউ আমার খোঁজে এলে, দিন সাতেকের জন্যে আমি বাইরে গেছি তাকে যেন জানিয়ে দেয়া হয়। ব্যস্!

সাতদিন পরে আমি বিছানা ছাড়ি।

ম্যানেজার এসে জানান্, একটি মেয়ে এই কদিন ধরেই রোজ নাকি আমার খোঁজ করেছে। বলে গেছে, আমি এখানে ফিরলেই যেন তাকে খবর দেওয়া হয়। কোন্ পাহাড়ে কোথায় যেন কী আউটিংয়ে যাওয়ার ঠিক করা রয়েছে। মায়া মিত্র, না, কী যেন মেয়েটির নাম।

মায়ার মিত্রতায় আর কাজ নেই বাবা! কী হবে এই মায়া বাড়িয়ে? বৃথাই মায়াবদ্ধ হওয়া! প্রাণের মায়া রাখলে প্রাণের মায়া-কে রাখা যায় না—মনে মনে আমি বলি। বলি আর আমার আড়মোড়া ভাঙি। আর, সেইদিনই ভাগি—আলমোড়া থেকে।

পাহাড়ে মেয়ে আর পাহাড়ের মায়া—একচোটে কাটাই!

[দুই]

আমটি আমি খাব পেড়ে

নানা ভঙ্গীর দৃষ্টি আছে—কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী জিনিসটা তাদের থেকে পৃথক্। কালিদাসের কালের কটাক্ষ এখনো দেখা যেতে পারে, কিন্তু সেকালের দৃষ্টিভঙ্গী মেলে না। দৃষ্টিভঙ্গী বদ্‌লায়, বদ্‌লাতে বাধ্য।

আবার দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্যও আছে। আপনার এবং আমার দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়। আপনি যাকে গোরু দেখছেন, আমি তাকে গুরুর মত দেখতে পারি। আপনার চোখে যে শস্য ছাড়া কিছু না, আমি তাকে শিষ্যস্থানীয় দেখি—আপনি যাকে গোলালু দেখছেন, আমার কাছে তা শাঁকালু। জিনিসটা হয়ত একরূপই, কিন্তু দেখবার দোষে (কিম্বা গুণে) বিভিন্নরূপে দেখা দেয়। দৃষ্টিভঙ্গীর মজাই এই!

প্রেমে পড়াটাও দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার। তা ছাড়া কি? এক দৃষ্টিতে যেটা প্রেম, অন্যদৃষ্টিতে (এবং অন্যের দৃষ্টিতে) সেইটাই নোংরামো। আবার বই, কাপড়, প্রেম, খানা-ডোবা এ-সবই পড়বার জন্যে হলেও এদের প্রত্যেকের পাঠ আলাদা, কিন্তু পাঠে আলাদা বলে ভ্রম হলেও আসলে আলাদা নয়, এইখানেই মশাই, দৃষ্টিভঙ্গীর মারপ্যাঁচ।

কটাক্ষ কালো চোখে এবং কটা চোখে সমান মারাত্মক হতে পারে—সর্বদাই মারাত্মক হতে পারে—কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর রঙ্ ক্ষণে ক্ষণে বদ্‌লাচ্ছে—তা কি পূর্বরাগে কি অনুরাগে আর কি অস্ত-রাগে, আর কি বা ঘোরতর রাগে।

দৃষ্টিভঙ্গীর এই ছলনায় একটু আগে যা প্রেমে-পড়া বলে বোধ হয়েছিল; একটু পরেই তাকে প্যাঁচে পড়া বলে জ্ঞান হয়। আগের পালার মুহূর্তপূর্ব 'লায়ন' পরমুহূর্তে পলায়নে পরিত্রাণ পেতে চায়। পুরুষসিংহ অবলীলায় লক্ষ্মীলাভ করেও পরিত্যাগ করতে পারলে বাঁচে। দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিহাস এই কাহিণীর নায়ক লোকনাথের অদৃষ্টে ঘটতে দেখা গেছল।

লোকনাথ, জয়কেষ্ট আর বনমালী—তিন বন্ধুতে বসে জুতো পালিশ করছিল—তাদের সান্ধ্য ভ্রমণের পূর্ব পরিচ্ছেদে। হঠাৎ লোকনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'নাঃ, এ-জীবনটা দেখছি বৃথাই গেল! কিস্‌সু হোলো না!'

প্রায় এক মাস ধরে ফি সন্ধ্যায় ঠিক বেরুবার মুখটিতেই এই মন্তব্য ওর মুখে শোনা গেছে। ওর বন্ধুরা শুনেছে, কোনো প্রশ্ন তোলেনি। কিন্তু জয়কেষ্টর আজ অসহ্য হোলো। সে বলে উঠ্‌ল, 'কেন, এই বুট-পালিশটা কি এতই খারাপ?'

জুতোর পালিশটা সে-ই কিনে এনেছিল।

'জুতোর পালিশ নয় মুখ্যু! বুকের মালিশ। প্রেমের কথা হচ্ছে। প্রেমে না পড়তে পারলে জীবনই ব্যর্থ! বেঁচে লাভ?' জবাব দিয়েছে লোকনাথ।

'প্রেমে পড়াকে আমি অধঃপতন বলে মনে করি।' এই বলে জয়কেষ্ট ফের নিজের জুতোয় মনোযোগ দিয়েছে।

'রোজ তিনজনে মিলে বেড়াতে বেরিয়ে কী যে হয়! কেন, রোজ রোজ একসঙ্গে না বেরুলে কি চলে না?' বনমালী কিন্তু অন্য কথা এনেছে, 'কেন, আলাদা আলাদা বেরুলে হয় কী?'

'হঠাৎ বারো রাজপুতের তের হাঁড়ি কেন হে?' জয়কেষ্ট অবাক হয়।

হাঁড়ির খবর বার হয় তখন। বনমালীই হাটে ভাঙে—

'তাহলে আমরা নিজের নিজের ভাগ্য যাচাই করে দেখতে পারি। একসঙ্গে ত্র্যহস্পর্শ ঘটিয়ে কারো ভাগ্যেই কোনো লাভ হয় না দেখা যাচ্ছে যখন।'

বনমালীর কথাটা লোকনাথের থেকে অন্য শোনালেও এবং একটু বন্য শোনালেও, বস্তুতঃ, দুটো কথাই এক কথা। দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন – কিন্তু দ্রষ্টব্য এক।

জয়কেষ্টর নজর কিন্তু জুতোর দিকেই। তবু সে আবার ঘাড় তুল্ল। তুলে বল্ল, 'তার মানে ?'

'তার মানে আমি বলতে চাই, আজ আর আমি তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি না। আজ আমি একলা একলা বেড়াবো। এবং আজ থেকে রোজ। রোজ রোজ। এমন কি, যদি দরকার হয় আমি অন্য মেসে সীট নিতেও রাজি আছি।' এই কথা বলেছে বনমালী। 'তোমাদের সঙ্গসুখে আমি মারা গেলাম।' অভিযোগের উপরে আবার তার অনুযোগ।

'শুনছ ? শুনছ ওর কথা ?' জুতো ফেলে জয়কেষ্ট লোকনাথের মুখের দিকে তাকালো :—"ও আমাদের জয়েণ্ট-ফেমিলি ছেড়ে পৃথক হয়ে যেতে চায়। শুন্ছ তো ? তুমি তো একটু আগে প্রেমের কথা শোনাচ্ছিলে। ওর কথায় নিশ্চয়ই তোমার হৃদয়ে আঘাত লেগেছে। প্রাণে খুব ব্যথা পেয়েছে আশা করি।'

'আমাদের অভাবে বোধ হচ্ছে ওর তেমন অসুবিধা হবে না—ভাব করবার মত কাউকে পেয়েছে বলে মনে হয়।' লোকনাথ সন্দেহ করে।

'পেয়েছিই তো,' বনমালীর জবাব জয়কেষ্টর কানে জয়ধ্বনির মতই বাজে : 'সেইজন্যেই তো তোমাদের ল্যাজে

বেঁধে নিয়ে ঘুরতে আর রাজি নই। তোমরা আমাকে মুক্তি দাও ভাই! একমাস কলকাতায় এসেছি। দেশের কলেজ থেকে একসঙ্গে পাশ করে বেরিয়েছি। এখানে এসে এক বাসায় উঠেছি, পোস্টগ্রাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হয়েছি—একসঙ্গে ঘুরে কলকাতার এক একটা রাস্তা একশো বার করে চষেছি। একত্র সিনেমায়ও গেছি। কিন্তু খুব হয়েছে, আর না! এই ল্যাজে ল্যাজে গাঁটছড়া থেকে এবার আমি মুক্তি চাই।...আমার মনের মত একটি মেয়ে আমি খুঁজে বার করব; এমন একটি মেয়ে,—সে যেমন সুন্দর তেমনি স্মার্ট্। তোমাদের আড়া-আড়ির থেকে, তোমাদের বিষদৃষ্টির আড়ালে একলা আমি তার সঙ্গে আলাপ জমাবো। ঘুরব, বেড়াব, এমন কি, একসঙ্গে সিনেমাতেও যেতে পারি।'

'চাল মারা হচ্ছে? বুঝিনে আমি?' জয়কেষ্ট তথাপি বুঝি সংশয়দোলায় দোলে। বনমালী সত্যি সত্যিই তাদের সঙ্গ ছাড়বে তা যেন ভাবতে পারে না। 'মেয়ে অতো সস্তা নয় হে!' সে বলে। হয়তো বা ওই বলে' বনমালীকে দুর্বল করতে চায়।

'চাল কি ডাল দেখতে পাবে এখনই।' এই বলে জুতো পায়ে বনমালী বেরিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। গটগট্ করেই। ফিরেও তাকালো না একবার।

জুতো-পালিশ মুলতুবি রেখে জয়কেষ্ট চুপ করে রইলো। অনেকক্ষণ পরে সে মুখ খুলল ঃ

'আচ্ছা, কী হয় মেয়েদের সঙ্গে ভাব করে'—বলো তো? আমি তো কোনো লাভ দেখি না। সবাই মেয়ে মেয়ে করে' পাগল!—একটা মেয়ে পেলে যেন বর্তে যায়। হাতে স্বর্গ পায় যেন! আমি তো ভাই এর মাথামুণ্ডু কিছু বুঝি নে। সত্যি

বল্‌তে, ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে সেদিন একটা মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে গেছলাম—এমন কিছু খারাপ কথা না, কিন্তু তাতেই যা এক কাণ্ড বাধলো—'

'জানি আমি!' বললো লোকনাথ, 'আমি তো কাছেই ছিলাম গো! মেয়েটা বললো, আপনি কিরকম ভদ্রলোক মশাই? চেনা নেই, শোনা নেই—গায়ে পড়ে কথা কইতে এয়েছেন। এমন বেয়াদপি করলে এক্ষুনি আমি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করবো।'

'ওরে বাব্‌বা! ভাবতেও বুক কাঁপে। এখনো আমার বুক গুড় গুড় করছে।' জয়কেষ্ট শিউরে উঠ্‌লো। 'জুতো পায়ে খটমটিয়ে চলা কলকাতার এইসব মেয়েরা কী রে!'

'বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে যায়।' লোকনাথ বলে। বলে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালে: 'তবুও ওদের পায়ের তলায় পড়ে থাকাও সুখের। নইলে বুকের ফুটপাথ তো ফাঁকা রে ভাই!'

'বুঝেছি, তোমাকেও ঐ ব্যারামে ধরেছে।···তুমিও আমাদের ছেড়ে যাবে। তুমিও দাগা দিয়ে যাবে আমাদের প্রাণে। তবে আর কেন অনর্থক তোমার বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করার জন্যে অকাতরে পড়ে থাকা। আমিই বরং আগে বিদায় হই।'

এই বলে, পালিশের কাজ আর না বাড়িয়ে জুতো পায়ে জয়কেষ্টও বিদায় নিল।

"তুমি! তুমিও গেলে! তুমিও গেলে অবশেষে!" তিরোহিত ছায়ার দিকে তাকিয়ে লোকনাথ ডুক্‌রে ওঠে: 'যাও। আমি একলাই থাক্‌ব। আমার জীবন তো গোল্লায় গেছে! আমি আর কোথায় যাবো?'

লোকশূন্য ঘরে লোকনাথ একাই পড়ে থাক্‌ল। একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌ল খানিক। কিন্তু একলা একলা বেড়াতে

কি ভালো লাগে ? কী হবে বেড়িয়ে ? কোথায়ই বা বেড়াবে ! অগত্যা, বিছানায় লম্বা হয়ে কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলে চুপ করে পড়ে রইল লোকনাথ।

আধঘণ্টা ঐভাবে পড়ে থাকার পর তার মনে হোলো কড়ি-কাঠের চেয়ে অধিকতর রমণীয় কলকাতায় কি কিছু নেই ? পথে-ঘাটে ইতস্ততঃ সর্বত্রই যাদের ছড়ানো দেখা যায়—তাদের তুলনায় কড়িকাঠ কোন হিসেবে অধিকতর দর্শনীয় ? এবং বাঞ্ছনীয় ? হতে পারে তারা গায়ে পড়তে গর্‌রাজি। কথা পাড়তে রাজি নয়। কিন্তু চোখে পড়তে তো তাদের আপত্তি নেই। চোখে দেখাটাই কি কম হোলো ? নাগালে পাবার —চেখে দেখবার সাধ না করে কেবল চোখে চোখে স্বাদ পাবার বাধা কি ?

আপনমনে ইত্যাকার জিজ্ঞাসাবাদের সদুত্তর লাভ করে' সেও পড়ল বেরিয়ে। যদিও তার একটা জুতো তখনো যুতসই হয়নি, অপালিশ থেকে গেছল, তবুও সে দ্বিধা করল না। এক পাটি জুতোর চাকচিক্যই নিজের পদমর্যাদার পক্ষে যথেষ্ট বলে' তার মনে হোলো। তাছাড়া, চেহারাটা তার একটু ঝক্‌ঝকে ছিল, দুটো পাটিই যদি মুখের মতন না হয় ক্ষতি কি ?

সন্ধ্যে হয় হয়, লোকনাথ বেরিয়েছে। সঙ্গীহীন, বন্ধুহীন, চারিধারের এত লোকের মধ্যে অনাথ বালকের মত ঘুরছে লোকনাথ। রাস্তাগুলোও হেঁটে হেঁটে ওর মুখস্থ হয়ে যাওয়া— তাদেরও কোনো আকর্ষণ ছিল না। কোনো কোণেই কোনো রোমাঞ্চের রস বা রহস্যের হাতছানি অপেক্ষা করে নেই।

অভ্যেস-হয়ে-যাওয়া পাড়ার অভ্যস্ত চায়ের দোকানে সান্ধ্য চা পান সেরে—ত্রিসন্ধ্যার নিত্যকর্ম সেরে নিয়ে—ফের সে পা বাড়িয়েছে—নিরুদ্দেশের পথে না হলেও নিরুদ্দেশ্যের

পথে। কিন্তু এবার সে যেন উৎসাহজনক কিছু দেখ্‌ল। একটি তরুণী চলেছিল তার আগে আগে। বেশ ছিম্‌ছাম্‌, ফিট্‌ফাট্‌—সুবেশিণী।

পা চালিয়ে লোকনাথ তার পাশাপাশি পৌঁছল। পৌঁছে দেখ্‌ল তার দৃষ্টিভঙ্গী ভুল বাৎলায় নি নেহাৎ। এক একটি মেয়ে আছে, যে-কোনো কোণ থেকে, এমন কি পেছন থেকেও, যাদের একটুখানি—কেবল কানের পশ্চাদ্‌ভাগ দেখলেই মনে হয় যে, নিশ্চয় ও সুন্দর—তারপর সাম্‌নে এসে দেখেও সে-ধারণা বদলাবার কোনো কারণ দেখা যায় না, মেয়েটি চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন-কারিণী তাদেরই একজন।

কিন্তু কি করে' কথা পাড়া যায়? মস্ত সমস্যাই। একটু ইতস্ততঃ করে লোকনাথ বলে' উঠলো হঠাৎ—'কোথাও যাচ্ছেন বুঝি?'

মেয়েটি চম্‌কে উঠে ফিরে তাকালো—'হ্যাঁ—কেন বলুন তো?'

'ভাবছিলুম যে আপনি বোধহয় আমার পথেই চলেছেন—তাই—তাই এম্‌নি জিজ্ঞেস করলুম।' লোকনাথ জড়িয়ে জড়িয়ে বলে: 'তাই ভাবছিলুম যে একটুখানি হয়ত আমরা এক সঙ্গেই যেতে পারি, অবশ্যি—অবশ্যি আপনি যদি কিছু না মনে করেন।'

'তা চলুন না, আপত্তি কি!' মেয়েটী বল্‌ল: "আপনি কোন্‌দিকে যাবেন?'

'আমার—আমার কোনো দিগ্বিদিক্‌ নেই। এম্‌নি বেরিয়েছি।'

'তা, বেশ তো। ভালোই তো!' মেয়েটি হাসলো এবার।

তরুণীর তেমন কোনো দ্বিধা দেখা গেল না। লোক-

নাথের একটু কেমন ঠেকলেও সে আশ্চর্য হোলো না। তার সঙ্গ তার বন্ধুদের কাছে অসুখ বলে' মনে হলেও অচেনা মেয়ের কাছে অসহ্য নাও হতে পারে। তাছাড়া, প্রথম-দর্শনেই যে সব দুর্ঘটনা ঘটে বলে' শোনা যায়, তার সবই তো একেবারে মিথ্যে না—তার সবটাই যে মিলিটারী লরীর মুখোমুখি ঘটবে এমন তো নাও হতে পারে। মেয়ে ও মিলিটারী লরীতে, অপমৃত্যু আর প্রেমে কিছু কিছু মিল থাক্‌লেও—গর্‌মিল্‌ও কি তেম্‌নি নেই? আর, সবে তো এখন দর্শনের এই প্রথম অধ্যায়। এই প্রিয়-দর্শনের।

আলাপের প্রথম ফাঁড়াটা কাটিয়ে, এবং জয়কেষ্টসুলভ কোনো প্রতিক্রিয়া হতে না দেখে লোকনাথ এবার আরো একটু দুঃসাহসী হোলো—বল্লো: 'চলুন না, কফি হাউসে যাওয়া যাক্! আপনার আপত্তি আছে?'

'না, ধন্যবাদ। কফি আমি খাইনে।'

'আপনার যদি তেমন কোনো তাড়া না থাকে, আর—ঘণ্টা

আড়াইএর অবসর থাকে যদি—তাহলে একটা সিনেমায় টিনেমায় গেলে কেমন হোতো ?' লোকনাথ আরও একটু অগ্রসর হয়।

'অনর্থক কেন পয়সা নষ্ট করবেন ?' বল্‌ল মেয়েটি।

এই প্রশ্নের কী উত্তর দেবে লোকনাথ ? প্রেমে পয়সার খর্চা আছেই—সুত্রপাতেও আছে, সূচিপত্রেও আছে—সূচিকাভরণে তো রয়েছেই—এ নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। কথাটা বাহুল্যমাত্র। তার উত্তর দেওয়া আরো বাহুল্য বিবেচনা করে' লোকনাথ নিরুত্তর হয়ে রইলো।

'তার চেয়ে আমি আপনাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারি যেখানে একটা পয়সা খরচ নেই। মেয়েরা আছে, গান টান আছে,—সময়টা বেশ আনন্দে কাটবে।...যাবেন ?' বলে মেয়েটি একটু থামে ঃ 'অবশ্যি। ঘণ্টাখানেক নষ্ট করবার মতো সময় যদি আপনার হাতে থাকে।'

'আপনার সঙ্গে যাওয়াটা কি সময় নষ্ট করা ?' লোকনাথ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে ঃ 'কী যে আপনি বলেন !'

লোকনাথ মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে চলে। ভাবতে ভাবতে যায়। কবি যে বলে গেছেন, প্রেমের ফাঁদ ভুবনে পাতা—কথাটা একেবারে যা তা না। ফাঁদ তো পাতাই রয়েছে, সাহস করে পা দিতে পারলেই হয়—তক্ষুনি পদস্খলনের সঙ্গে পাতঞ্জলযোগ ঘটবে।... প্রেম সবসময়েই নিপাতনে সিদ্ধ। কখনো ছেলের দিক থেকে, কখনো বা মেয়ের দিক থেকে। কিন্তু সর্বদা যারা উঠে পড়ার তালে থাকে সেই সতর্করা কখনো ভালো করে প্রেমে পড়তে পারে না। প্রেম যেমন প্রথমদর্শনের একচেটে—রীতিমত ভাবে পড়া তেমনি তার দ্বিতীয় চোট্। চোখ কান বুজে পড়া চাই। চল্‌তে চল্‌তে পড়া হচ্ছে তার চাল—পড়তে পড়তে চলা—তার চলন।

প্রেমের এই একমাত্র পাঠ আর অদ্বিতীয় পথ। এভাবে যতই সে ভাবে ততই তার রোমাঞ্চ হয়। অভাবিত ভাবে কত সহজে প্রেমের পথে পা বাড়িয়েছে ভেবে সে অবাক্ হয়ে যায়।

আরো খানিক চলবার পর তারা একটা থাম্ওয়ালা মস্ত বাড়ীর সামনে এসে থামে। তারপরে মেয়েটি তাকে নিয়ে ভেতরে ঢোকে।

প্রকাণ্ড হল্ঘরের মতই। বিস্তর বেঞ্চি পাতা। কিন্তু তার বেশীর ভাগই ফাঁকা পড়ে আছে। সামনে একটুখানি থিয়েটারের ষ্টেজের মতন দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কোনো সিন্‌সিনারি নেই এবং সেখানে একটিমাত্র অভিনেতা - যদি তিনি অভিনেতাই হন্। নাটকটা যে কী, লোকনাথ তার আঁচ পেল না। তবে অভিনেতার চাঁছাছোলা গলা আর দাড়ি বেশ পালিশ করা এটা সে লক্ষ্য করল।

দর্শকসংখ্যা মুষ্টিমেয়। জন বিশেক লোক ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত হয়ে বসে। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বল্‌ছিলেন—

'আজকালকার ছেলেদের ধর্মে মতি নেই, সিনেমার রুচি। আগে আমাদের সমাজের প্রত্যেক উপাসনায় লোক ধরত না— এখন তাদের রাস্তা থেকে ধরে ধরে আন্‌তে হয়··'

এমন সময় মেয়েটি এগিয়ে সেই বিবৃতিদাতাকে সম্বোধন করল: 'বাবা, আমি আর একজন ভদ্রলোককে নিয়ে এসেছি।'

'বেশ করেছ মা। ওঁকে সাম্‌নে নিয়ে এসো—ওই ধারটায় —যেখানে আরও দু'জন ভদ্রলোক বসে আছেন তাঁদের পাশে এনে বসাও।' বক্তৃতা থামিয়ে একগাল হেসে তিনি বল্লেন।

সম্মুখীন হয়ে সেইখানে বসতে গিয়ে লোকনাথ হাঁ হয়ে গেল। যে দু'জন লোক ফাঁক হয়ে মাঝখানে তার জায়গা করে দিলে, তারা আর কেউ না—বনমালী আর জয়কেষ্ট!

[তিন]

ইঁদুরছানা ভয়েই মরে

'—ধরলে কুমার ছাড়ে কিন্তু ধরলে ছাড়ে না স্ত্রী, বুঝলি রে গোকুল ?" বিখ্যাত দ্বিজেন্দ্রলাল-ব্যাখ্যাত সর্ব-শাস্ত্রের সার-তত্ত্ব ভাইয়ের কাছে বিস্তার করার চেষ্টা পাচ্ছিল গোলোক।

'বিয়ে না করলেই কি ছাড়ান্ আছে তুমি ভাবো ?' দাদার কথায় সায় দিতে পারে না গোকুল।

'বলে সর্বশাস্ত্রী—' বলে সুরু করে শেষে গিয়ে 'না—স্ত্রী'-র সঙ্গে মহাকবি যেমন মিলিয়েছেন সেইরকম অদ্ভুত মিল ছিলো দুই ভাইয়ের। মাথার চুল থেকে পায়ের নোখ অব্দি। একই ধাঁচের চোখ-মুখ-হাত-পা—হাত-পা নাড়া পর্যন্ত! না-রোগা, না মোটা এক কিসিমের চেহারা। মাথাভরা কোঁকড়া চুল দুই ভাইয়েরই। কোথাও কোনো বৈলক্ষণ্য নেই। এমন কি টেরির তারতম্য থেকেও যে কে রাম কে লক্ষ্মণ টের পাওয়া যাবে তার যো নেইকো। আওয়াজ অব্দি এক।

কেবল গোলোকের কপালের রেখা গুটিকয়েক বেশি বুঝি! সে বিবাহিত।

ভায়ের কথায় গোলোক হাসে। ছেলে-মানুষ! নারী-চরিত্রের কী বা জানে ? আর পৃথিবীরই বা কতোটুকু ? তার মতো জানবার কথা নয় তার—হাজার হোক, বয়সে তো ছোটোই! তার চেয়ে অনেক—অনেক সেকেণ্ড পরে সে পৃথিবীতে এসেছে।

'বিয়ে না করলে বরং স্ত্রীর হাতে বাঁচন আছে,' গোলোক

শোনায়ঃ 'মানে, তুই জলেই নামলিনে। কুমীরের এলাকায় গেলিই নে একদম্‌। কিন্তু বাবা, বিয়ে করেছো কি মরেছো!'

'কুমীর না কুমারী ?' গোকুল বাধা দিয়ে শুধায়। দাদার কথায় ওর যেন গোলমাল বাধে। সত্যি বলতে, পৃথিবীতে বাস করে কুমারীর হাত থেকে নিস্তার কই ? তাদের এলাকা কোথায় না ! কুমীর কেবল জলেই থাকে জানি, কিন্তু কুমারীরা জলে-স্থলে। এমন কি, অন্তরীক্ষেও তাদের ঘোরাফেরা—যদি নিজের অন্তরের দিকে ভালো করে নিরীক্ষণ করো ! আর সেই সব কুমারীদের শুভ্র দন্তপংক্তি। ঠিক কুমীরদের মত অতটা আকর্ণ-বিস্তৃত না হলেও, মারাত্মক হাসি ছড়াচ্ছেই !

'একই কথা। বিয়ের আগে যে কুমারী, বিয়ের পরে সে-ই কুমীর।'

'তাহলে আর আছো কোথায়? ঘরে বাইরে যেখানেই যাও না, যেদিকেই পা বাড়াও—ভূভারতের সর্বত্রই ওঁরা। পদে পদেই বিপদ তোমার! ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভূগোলের মতই বুঝলে দাদা, কাঞ্চনজঙ্ঘা আর কন্যাকুমারী দিয়ে বাঁধাই।'

'কাঞ্চনের কথা তুললি আবার?' দাদার মুখ ব্যাজার হয়: 'ওর নাম করিসনে। শুনলেই আমার বুক কাঁপে!'

'বুক কাঁপলে আর করছো কী! কামিনী-কাঞ্চন তো তুমি ছাড়তে পারবে না। আপিস বন্ধ করে বাড়ী তো তোমায় ফিরতেই হবে এক্ষুনি।''

গোলোকদের বাবার ছিলো জুতোর ব্যবসা। কিন্তু তিনি বেঁচে থাকতে-থাকতেই সে-কারবার মাথায় উঠেছিলো। ছাতার কারখানা খুলতে হয়েছিলো তাঁকে। তারপর তিনি মারা যেতেই সেই কারবারে ছাতা পড়বার মত হোলো।

তারপরে, যমজ-দুই-ভাইয়ে মিলে প্রাণ দিয়ে কারবারের ছাতা তুলেছে। সেই ছাতা খুলেছে আবার।

একই ছাতের তলায় বেড়ে একই ছাতার তলায় দু'জন মাথা তুলেছে বলেই দু' ভাইয়ের বুঝি অমন ঐক্য। প্রকৃতির দানছত্র থেকে দেওয়া দৈহিক মিলের ওপরে ছত্রের দানে কর্ম-সূত্রে পাওয়া মনের মিল।

গোলোক বিয়ে করেছিল। গোকুল করেনি, পাছে দু' ভায়ের মিলের ঘরে গরমিল আসে সেই ভয়েই হয়ত বা। দু'-জনের মুখে চোখে, চলা-ফেরায়, ধরণ-ধারণে যতই ঐক্য থাক না, বিয়ের ব্যাপারে এই একতা বজায় রাখা যায় না। দুই

ভাইয়ের এক বৌ হলে চলে না, (বাংলাদেশ পাণ্ডব-বর্জিত !) আলাদা বৌ ঘরে আনতেই হয়।

আর, স্ত্রী থেকেই অনৈক্য। গেরো বাড়ে, গেরস্থালি পৃথক্ হয়। একান্নবর্তী পরিবার, শুধু পরিবারের জন্যেই ক্রমে বাহান্নবর্তী হয়ে দাঁড়ায়। কখনো কিছুর জন্যেই—ভাইয়ের সাথে পার্থক্য না হোক, বোধ করি সেই বাসনাতেই বিয়ে করেনি গোকুল। পৃথিবীতে এক সঙ্গে এসে—এক ছাতার এবং এক ছাতের তলায় থেকে—এক যাত্রায় পৃথক্ ফল কেন হবে ?

বিয়ে করে মস্ত ভুল করেছে জানতো গোলোক। ঘরের বাহির হলেই আরো যেন বেশি করে জানতো। কারখানার আপিসঘরে বসে প্রত্যহই সেই তত্ত্ব নতুন করে জানাতো তার ভাইকে।

কিন্তু ভুল মানুষ করেই। মুহূর্তের মধ্যেই তা ঘটে যায়। তারপরে যতই না সেই অঙ্ক কষো, সে-আঁক কিছুতেই আর মেলে না। মেলবার নয় আর। গোলোকের অঙ্কশায়িনী সেই ভুল !

কিন্তু কাঞ্চনের চোখের সেই চাউনি—বিয়ের আগেকার ! মনে করলে এখনো বুঝি টনক্ নড়ে। গীতের ভাষা আর গীতার ভাষ্য—একাধারে সেই চোখে ! 'ক্লৈবং মাস্ম গমঃ পার্থ',—বলে অর্জুনকে ত্যক্ত করে তুলতে শ্রীকৃষ্ণকে যতো না অনুস্বর খরচ করতে হয়েছিল তার চেয়ে ঢের কমে, কাঞ্চন, শুধু একমাত্র আঁখি-শরেই তাকে সেরেছে। তাকে বধ করে নিজের 'প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' করেছে।

সে-চাউনি অবশ্যি বদ্‌লেছে এখন। তার ভাষা এখন ভিন্ন, ভাবও আলাদা। তাহলেও এখনো সেখানে সেই গীতার তত্ত্ব—

সেই চোখের গর্তে। এক মর্ম থেকে আরেক মর্মান্তিকে—কর্মযোগ থেকে বিষাদযোগে অনুসৃত।

এই যোগাযোগের থেকে বুঝি কোনোদিন তার পরিত্রাণ নেই, গোলোক বিষণ্ণমনে ভাবে একেক সময়।

কিন্তু পরিত্রাণ ছিল। একদা তা দেখা দিল - একেবারে অকস্মাৎ—অভাবিতভাবেই।

একদিন দুপুরে গোলোক আপিসে বসে কাজ করছে, গোকুল এলো বাজার ঘুরে। তেতে পুড়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরলো সে।

ফিরে এসে নিজের কোটটি খুলে পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখলো চেয়ারের পিঠে। যেমন সে রোজ রাখে। তারপরে বসে পড়ে বললে—ভারী ঘুম পাচ্ছে দাদা।

বলেই সে চোখ বুজলো।···ঘুমিয়ে পড়লো চিরদিনের মতই!

ভাইয়ের অভাবে ভাবাবেগে অভিভূত গোলোক, এরকমটা যে ঘটবে, গোড়ায় ভাবতেই পারল না। তারপর আদিম অবিশ্বাস দূর হলে সে হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর ক্রমে ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কাটলে অবাক্ লাগলো তার। বিস্ময়ের পরে এলো আশা। আশার থেকে আশ্বাস।

গোলোক চট করে উঠে ভাইয়ের কোটটা বদলে নিলো—নিজেরটা গোকুলের চেয়ারের পিঠে রেখে তারটা চড়ালো নিজের গায়ে। হাতঘড়িটাও পাল্‌টালো। সার্ট আর ধুতি এক রকমেরই ছিলো দু'ভায়ের—না বদলালেও কিছু আসে যায় না।

পরলোকগত ভায়ের সঙ্গে এভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে খারাপ লাগছিল আর! কিন্তু এছাড়া বাঁচনের পথ তার কই? এই সব সেরে সুরে তারপরে সে ডাক দিলো ডাক্তারকে।

ফোন্ করার খানিক বাদেই তিনি এলেন। এসে ভালো করে দেখলেন। দেখে বললেন—হয়ে গেছে।

বলে আরেকবার ভালো করে দেখলেন। আপাদমস্তক। গোলোককেই দেখলেন এবার।

সন্দিগ্ধনেত্রে তার দিকে তাকিয়ে বল্লেন—পুলিশে খবর দিতে হয়। এখান থেকে এ-লাশ মর্গে যাবে। ময়না-তদন্ত হওয়া চাই। কি করে মরলো ত জানা দরকার।

ময়নার নিয়ে কোনো ভাবনা ছিল না গোলোকের। সে ভাবছিল পাপিয়ার কথা। 'পিয়া মিলন্ কো যানা হায়!' সব হায়হায়—চরম ধাক্কা সেই সঙ্গমস্থলেই! নিজের ঘরের কোণে। ঘরের কনের কাছে। তার কাছে যেতে হবে আজ—বর হয়ে নয়—দেবর হয়ে। সত্যিকারের অগ্নিপরীক্ষা সেইখানেই।

গোলোক সে নয়কো আর। আজ থেকে—এরপর থেকে—সে গোলোকের ভাই-গোকুল। এই পরীক্ষায় যদি সে সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পারে তাহলেই সে নিরাপদ, নির্বিঘ্ন, স্ত্রীহীন—মুক্তপুরুষ! চিরদিনের মতই। তারপরে তাকে আর কে পায়?

কিন্তু মনে যতই স্ফূর্তি হোক্, বাইরে তা প্রকাশ করা চলবে না। নিজের মহলে যাবার আগে আপিসের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজের মহলা দেয়। অভিনয় তার নিখুঁৎ হওয়া চাই। আগাগোড়া একেবারে নিভুঁল। চোখের কোণে একটু জুতোর কালি লাগায়। মুখখানাকে চুণ করে। এইভাবে নিজের মুখে চুণকালি লাগিয়ে সে হাসে। কিন্তু হাসি-মুখ আর কি সাজে তার এখন? দাদা গোলোকধামে গেছেন, গোকুল-পুরী তো এখন অন্ধকার!

নিজের মৃত্যুসংবাদ নিজমুখে দেওয়া যেন কীরকম! আবার সেকথা নিজের কানে শোনা! আশ্চর্য এক অনুভূতি সে বোধ করে। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হবে তার আজ। কাঞ্চন কতো কান্নাকাটিই না করবে! সে নিজেও কিছু কাঁদবে তো? তার নিজেরই কি এই ভ্রাতৃশোক কম লাগার কথা? রসিয়ে রসিয়ে সমস্তই সে আস্বাদ করতে থাকে আপন মনে। তারিয়ে তারিয়ে চাখে। ভেবে দেখলে একটু উপভোগ্যই বই কি।

কতো বন্ধুবান্ধব আসবে আহা উহু করতে। তাদের মধ্যে যার যার মন একটু নরম, হয়ত···হয়ত সে অশ্রুসম্বরণ করতে পারবে না। গোলোক লোকটা কতো ভালো ছিলো, বলবে সবাই। কিন্তু কী করবে ভায়া? জীবন তো কারু হাতধরা নয়। সবাইকেই আমাদের মরতে হবে একদিন। কেঁদে আর কী করবে বলো! বুক বেঁধে নিজেকে শক্ত করো। তোমার বৌদিকে সামলাও। আর যাতে আমাদের স্নেহের গোলকের পরলোকের কাজটা বেশ ভালোভাবে হয়···তার ব্যবস্থায় লাগো এখন। তাতেই তোমার দাদার আত্মার তৃপ্তি···তোমাদের নিজেদেরো কল্যাণ······

নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করা···আর, পাত পেড়ে তার ভোজ খাওয়া···আহা, কে জানে কতই না আরামের!

কড়া নাড়তেই কাঞ্চন দরোজা খুললো—'এত দেরি হোলো যে আজ?"

'আমি—আমি গোকুল।' গোলোক বলে—অম্লানবদনে। তারপরে ম্লানবদনে সুরু করতে যায়—'আপিসে আজ একটা ভারী···'

'ও, তুমি! তা, ঘরে এসো।'

ওকে বসিয়ে কাঞ্চন এক পেয়ালা চা নিয়ে আসে।

'চা? না, চা থাক্।' বলে সে বিষণ্ণসুরে টান দেয়ঃ চোখের ওপর রুমাল বুলিয়ে বলে—'চা আজ থাক্ বৌদি। শোনো, তোমায় একটা—একটা বড়ো দুঃসংবাদ আছে · '

কাঞ্চন আপাদমস্তক সপ্রশ্ন হয়ে ওঠে।

'দাদা···দাদা আর নেই···' সে জানায়। গোলোক তার সাধনোচিত ধামে গেছে। কিন্তু কোন্ ভাষায় বিষয়টা ব্যক্ত করলে সুষ্ঠু হবে সে ভেবে পায় না। না-প্রকাশ করতে পারার লজ্জাটা, চক্ষুলজ্জাই হয়ত, চোখে রুমাল দিয়ে ঢাকতে চায়।

'আর নেই—তার মানে?'

'দাদা আজ আপিসে···হার্টফেল্ করে হঠাৎ—' এর বেশি সে বলতে পারে না। কিন্তু বলার বুঝি দরকারও করে না আর।

গোলোক চোখ তুলে চায়। দুঃসহ আঘাতটা কাঞ্চন কি-ভাবে নিল দেখতে চায় বুঝি। '···পুলিশে এসে দাদার লাশ নিয়ে গেছে···'

কাঞ্চন তেমন বিচলিত হয় না। শুধু ওর ওষ্ঠাধর কাঁপে একটুখানি - 'অ্যাঁ?···ও—ও নেই!'···অর্দ্ধভগ্ন কণ্ঠ হতে বার হয় বারেক···আস্তে আস্তে খাটের একধারে সে বসে পড়ে।

খাটের অন্যধারে বসে গোলোক সান্ত্বনার ভাষা খুঁজতে থাকে। গীতার শোলোকের বাংলা।

'বৌদি, তুমি কেঁদনা। তোমাকে কাঁদতে দেখলে দাদার আত্মা কখনো সুখী হবে না · '

কাঞ্চন কাঁদে না। ··'কিছু ভেব না তুমি। দাদা গেছেন বটে, কিন্তু আমি তো আছি · !' গোলোক বলে আর মনে মনে বাৎলায়ঃ 'বাব্বা, এত সহজে ফাঁড়া কাটবে, এত শীগ্গির মুক্তি পাবো ভাবতেও পারিনি!'

হ্যাঁ, এতদিনে ইতি! সেই ইতি—যার পরে আর ইত্যাকার নেই—'পুনশ্চ' নেই আর।

কাঞ্চন চোখ তোলে। তার চোখ তুলে চায়। চোখের তুলি দিয়ে কী যেন আঁকতে চায়—গোলকের মর্মপটে। তার চোখের কোণে যেন কোন্ আগেকার চাহনি! আর সেই চাহনিতে গীতা নয়—গীতাঞ্জলিই বুঝিবা···'মুক্তি? ওরে! মুক্তি কোথায় পাবি? মুক্তি কোথায় আছে?'

কাঞ্চন তার কাছ ঘেঁষে আসে···তার চোখের সেই চাওয়া নিয়ে! সেই সর্পিল চাহনি গোলোকের চোখের সামনে! সেই অদূরদৃষ্টি—সঠিক বলতে, চোখের অদূরে সেই দৃষ্টি—যার খপ্পরে পড়ে লোকে তপস্যা আর পয়সা হাতছাড়া করে। মুখ্যু আর মুমুক্ষুরা সমান আত্মহারা হয়। কুমীরসুলভ চোখের সেই বশীকরণীতে সে অবশ হয়ে পড়ে। যেমন হয়েছিল অনেক—অনেকদিন আগে। নিজের কৌমার্য্যদশায়।

'ভালোই হোলো, ঠাকুরপো!' কাঞ্চনের গলা থেকে গড়ায়ঃ 'তোমার দাদা গেছেন সে ভালোই হয়েছে একরকম। এখন থেকে আমাদের আর লুকিয়ে লুকিয়ে ওঁর আঁড়ালে... ভালোই হয়েছে ফাঁড়া কেটে গিয়ে·'

সঙ্গে সঙ্গে দুটি সুগঠিত শক্ত বাহু এসে গোলোকের গলা জড়ায়। সেই আঁখি রে! আর, ওই চোখের কামড়ের ওপরে আবার সেই দন্তপংক্তি!!

[চার]

ঈগলপাখী পাছে ধরে

প্রিসিলার আঙুলে চোখ পড়তেই চোখ যেন ঝলসে গেল। কে যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখালো আমায়।

'আংটি! আরে, আংটি কোথায় পেলি?' ভাগ্নির সৌভাগ্য দেখে, বলতে কি, আমার একটু হিংসেই হয়—"হীরের আংটিই যে! দিলে কে?'

'এক নবাব।'

'নবাব যে, তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কার নবাবি, শুনতে পাই? নবাব-পুত্তুরটি কে?'

'বলছি তো, নবাব।' জবাব দেয় ওঃ 'নবাব কাকে বলে তা জানো না?'

'জানবো না কেন? নবাব, আমীর, ওম্‌রা, উল্‌মুলুক্—সব জানি। এক কথায় মোরোগ মোসল্‌মান, মোগলাই ব্যাপার,' বাধ্য হয়ে অগত্যা নিজের জ্ঞানবত্তা জাহির করতে হয়—'কিন্তু এই খান্‌জার্থাটি কে, তাই আমি জানতে চাইছি—কোথাকার উল্‌মুলুক্?'

'মোটেই উল্লুক না।' সে ফোঁস করে ওঠে—'ভালো লোক। চমৎকার লোক। নবাব আহ্‌সান্ হাবীব্—শুনেছো এই নাম? কোথাকার জানিনে, কিন্তু দস্তুরমতো একজন মিলিটারি অফিসার, বুঝলে? দিল্লীর বোধ হচ্ছে।'

'বুঝেচি। লাল কেল্লার কাপ্তেন টাপ্তেন হতে পারে। দেখতে কেমন?'

'দিব্যি দেখতে। আমার জজ দাদুর মতই চেহারা।' গজগজ করে ও।

জজ দেখানো মানেই ঘুরিয়ে হাইকোর্ট দেখানো! আমাকেই আবার! নিজের মামাকেই! কিন্তু প্রিসিলা বলেই এবং রাগের চেয়ে কৌতূহল বেশী বলেই এই শীলাবর্ষণ আমার গায়ে লাগে না। রাগ দম্য, কিন্তু কৌতূহল আমার অদম্য।

তাছাড়া খবরের এক টুকরো শুনে আমি স্থির থাকতে পারিনে—সবখানি না জানা পর্যন্ত। একেই আমার এমনিতেই মাথা ধরে আজকাল, তার ওপরে ফের যদি আধ-কপালে দেখা দেয়, তাহলে একটা মাথার মধ্যে দেড়খানা মাথা ধরলে —ধরাতে গেলে ঠিক কোথায় ধরাবো আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে তা ধারণা করতে পারি না।

'বলছি আমি শোনো! রুচিনবাবু সেদিন ফোন্ করলেন আমায়'—সুরু করলো প্রিসিলা—'রুচিরিন্দ্র বাবুকে জানো তো?'

'ঠাকুরবাড়ির কেউ বুঝি?' ইন্দ্রচন্দ্ররা ঠাকুরবাড়ির একচেটে—এই রকমই আমি জানতাম।

'কোনো জন্মে না! কেন, ঠাকুরবাড়ির বাইরে কি আর কেউকেটা কোনো থাকতে নেই?' অবাক্ হয় প্রিসিলা—'রুচিনবাবু জনৈক আর্টিস্ট্। আনকোরা আধুনিক প্রতিভা।'

'হ্যাঁ, বলেছিলি বটে তুই একবার। মনে পড়ছে।' আমার খেয়াল হয়।—'তা, উক্ত রচিনবাবু...?'

'উক্তি করলেন টেলিফোনে সেদিন,' প্রিসিলা খেই ধরে কথার—'বাবলু মিত্তির বড়োদিনে তাঁর বিরাট প্রাসাদে বিপুল প্রীতিভোজ দিচ্ছেন—তুমি সেখানে আমার সঙ্গে যাবে প্রিসিলা দেবি?'

'একটু প্রাঞ্জল করে বলুন তো, আমি বললাম।' [প্রিসিলা বল্লে]

'বাবুলু মিত্তিরটি কে ?' আমি জিগ্যেস করি, 'আর কোথায় বা তাঁর প্রাসাদ—খোলসা করে বল্ তো ?' সাপ আর তার খোলস – দুটি বিষয়েই আমি বিশদ হতে চাই।

'বাবলু মিত্তিরের নাম শোনোনি ? বিরাট বড়লোক বাবলু মিত্তির ? রুচিনবাবু জানালেন ব্যাপার কিছুই না, এটা একটা দোরোখা পার্টি কিনা, তাই সেখানে যেতে হলে একটি স্ত্রী-চরিত্র সঙ্গে নেয়া দরকার। সেই জন্যেই সঙ্গী হিসেবে আমাকে তাঁর—'

'বুঝেচি, আর বলতে হবে না তোকে। বাংলা ছবি আর বাঙালীর পার্টি – নারী-চরিত্র না হলে অচল। মেয়ের পার্ট থাকা চাই-ই, তিলোত্তমা নইলে সব কিছুই বাতিল।' আমি বললাম।—'কেবল তাল বেতাল নিয়ে কোনো পালা জমে না।'

'পার্টিতে যাবার জন্যে মেয়েরা পা তুলে থাকে, জানোই-তো মেজ মামা, কিন্তু আমি তোমার তেমন হ্যাংলা মেয়ে নই। আমি একটু আমতা আমতা করলাম – যদিও ফোনে নিখুঁতভাবে খুঁৎ খুঁৎ করা খুবই শক্ত—তাহলেও একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, তা, পার্টিতে যাওয়া আর আপনার সঙ্গে যাওয়া তো আনন্দের কথাই রুচিনবাবু, কিন্তু আপনার তালিকায় সঙ্গিনী হবার মত আমিই একমাত্র মেয়ে এমন কথা নিশ্চয়ই আপনি ঘূণাক্ষরেও আমায় জানাচ্ছেন না ?'

'হ্যাঁ, ঘূণাক্ষরে।' তিনি জানালেন—'ঘূণাক্ষরেই জানাচ্ছি।'

'কেন, আপনার বৌ ? স্ত্রী-চরিত্রের প্রয়োজন তো তাঁকে

দিয়েও—মানে, আমি বল্‌ছিলাম কি, অন্য কাউকে ঐ ভূমিকা দিলে তিনি কি রাগ করবেন না ?'

'আমার বৌ ? তার মা—মারা যাচ্ছে কি না—'

'মা মারা যাচ্ছে ? মানে, তাঁর মা—আপনার আপন শ্বাশুড়ি—অ্যাঁ ? আপনার শ্বাশুড়ি মরমর, আর আপনি—চলেছেন প্রীতিভোজে ফূর্তি লুটতে ? ছি—ছিঃ !' ধিক্কার না দিয়ে আমি পারি না।—'ছিঃ রুচিন বাবু, ছিঃ! এটা আপনার সুরুচির পরিচায়ক নয়।'

'ওহো। কী বলতে কী শুনেচো! মা মারা যাচ্ছে না, মামারা বাড়ী যাচ্ছে—মানে, তার মামারা বাড়ী যাচ্ছে আজ!—মামার বাড়ী যাচ্ছে তারা—তাদের নিজেদের মামাবাড়ী নয়—আমার বৌয়ের মামাত বাড়ীতেই ফেরৎ যাচ্ছে। অর্থাৎ আমার শ্বশুর বাড়ীতেই রওনা দিচ্ছে সবাই। পরিষ্কার হোলো এবার ?'

'কী বললেন ? আপনার শ্বশুরবাড়ীতে যাচ্ছেন আপনার বৌয়ের মামারা ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমার শ্বশুরবাড়ীতে কেন যে তারা যাচ্ছে তা আমি বলতে পারব না। সেটা একটা রহস্যই আমার কাছে। তারা যে এমন অসম্ভব কাণ্ড করবে, কখনো নামবে আমাদের ঘাড় থেকে—এরূপ দুরাশা স্বপ্নেও আমি পোষণ করিনি। যাক্, তারা বিদেয় নিচ্ছে আজ। ফেরৎ যাচ্ছে সব। সেই নিয়েই ব্যস্ত আছেন আমার গিন্নি, তাই তিনি…'

'তাই বলুন্! যেতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু যানবাহন ?' আমি শুধালাম—'সেদিনের মতন ঐ রকম ট্যাং ট্যাং করে আমি ছুটতে পারব না আপনার সঙ্গে।'

'মিষ্টার মিত্তির তাঁর গাড়ী পাঠাবেন। তাঁর রাজপ্রাসাদ

একটু দূরে— সহরতলিতেই কিনা ! তুমি তৈরী থেকো, তোমার বাড়ী থেকে তোমাকে আমি কুড়িয়ে নিয়ে যাব। সেই ষ্টুডি-বেকার হোলো যান, আর বাহন ? বাহন এই চিরকেলে বেকার…খোদ্ আমি।'

'তবে, ভালো কথা', বলে আবার তিনি জানালেন…'পার্টি কখন ভাঙে তার কোনো স্থিরতা নেই। রাত্রে হয়তো সেখানে থাকতে হতে পারে। যদি তোমায় রাত কাটাতেই হয় তাহলে তার জন্যে তৈরী হয়ে যেয়ো।'

শোনো মেজমামা ! শুনেই না আমি তক্ষুনি তক্ষুনি নেমন্তন্ন নাকচ করে দিলুম। অমন কথা আমায় বলবার সাহস করতে পারে কেউ ? আমার মুখের ওপর ? তাও সামনা সামনি না, টেলিফোনেই ? কোনো ভদ্র মেয়ে অমন কথায় কর্ণপাত করে ? অন্ততঃ, ফোনে তো নয়ই। আর কেমন ভাবে বল্ল কথাটা ! বলার ধরণটা দেখেচো একবার ?'

'দেখেচি। যেন কথাচ্ছলেই বলা আর কি !' আমি বলি।

'যেন একটা কথার কথা ! এমন কিছুই গুরুতর কথা নয়। অমন করে ও-কথা পাড়লে স্বভাবতই আমার আপত্তি হবার কথা। তা হওয়া কি অনুচিত, তুমিই বলো না মেজমামা ? আমি বল্লাম, রুচিরিন্দ্র বাবু, আপনি কি আমাকে তথাকথিত কোনো নাইট ক্লাবে নিয়ে যেতে চাইছেন ? আর, আমাকে চিরাচরিত একজন সাধারণ মেয়ে পেয়েছেন ? তা যদি হয় তো—এই পর্যন্ত বলে আমি থামলাম।'

'আবার বুঝি তোকে সেই হাওড়া-আমৃতায় পেলো ?'

'আমৃতা আমৃতা কেন ? পরিষ্কার স্পষ্ট কথা। কিন্তু একজন ভদ্রলোককে ওর বেশি আর কী বলা যায় ? কি করে বলা যায় ? কোনো ভদ্রমেয়ে কি ওর চেয়ে স্পষ্ট করে

বলতে পারে? শুনে ভদ্রলোক বল্লেন···ইয়াল্লা! প্রিসিলা দেবি, কী শুনতে তুমি কী শুনেচো। মেয়েদের সঙ্গে আমার ব্যবহার সব সময় হয়ত রুচিসঙ্গত হয় না আমি জানি, আমার নামটা মিস্‌নোমার তাও আমি মানি, আমরা, মানে শিল্পীরা, সাধারণত শালীনতাবোধের বাইরে, সভ্য সামাজিকতার সঙ্গে সব সময়ে খাপ খাইয়ে চলতে পারি না তাও ঠিক, সর্বদা আমরা ভব্যতার পরিপন্থী সেকথা মানতেও বাধা নেই, কিন্তু তাই বলে আমার দ্বারা কোনো নারীর সম্মানহানিকর কিছু ঘটবে··· আমি কোনো অপাপবিদ্ধা কুমারীর মর্যাদা-লাঘবের কারণ হবো, এমন কথা তুমি কি করে ভাবতে পারলে প্রিসিলা দেবি?'

'আপনি নিজেকে বড্ডো বেশি বাড়িয়ে তুলছেন!' বল্লাম আমি তাঁকে।...'ভয়ঙ্কর ফাঁপাচ্ছেন আপনাকে।'

'না বলে পারলুম না। নিজের অতো সুখ্যাতি গাওয়া কি ভালো? আত্মপ্রশংসা কি নিন্দনীয় নয়? তুমিই বলোনা মেজমামা?'

'তা বটে!' আমি বলি।

'যাক্। বড়দিন তো এলো। রুচিনবাবুও এলেন গাড়ি নিয়ে। বিকেলের দিকে আমরা বেরুলাম···বেলগেছের মেডিকেল কলেজের পাশ দিয়ে চলে গেছে যে-রাস্তাটা·· চমৎকার পীচ-ঢালাই পথ! বসিরহাট না ইটিণ্ডাঘাট কোথায় যেন গিয়ে পড়েছে। অনেকখানি রাস্তা! আমাদের প্রাসাদ-লাভ করতে সন্ধ্যে উৎরে গেল। তবে হ্যাঁ, প্রাসাদ বটে একখানা! কলকাতার বাইরে বলেই অমন বাড়ি সম্ভব। শুনলাম নাকি আবার বাগানও আছে ওর মধ্যে। না না, বাড়ির মধ্যে নয়। বাড়ির ভেতর আবার বাগান থাকে নাকি? বাগানের মধ্যেই তো বাড়ি থাকে? বাড়ির পেছন ধারটায়...

আমগাছ জামগাছ জামরুল গাছ নিয়ে···পুকুর টুকুর নিয়ে···'

'মাছ টাছ নিয়ে ?' আমি আরো বেশি আঁচ পাই।

'আমরা হল্‌-এর ভেতরে হাজির হলাম। প্রকাণ্ড হল্‌। হল্‌-ভর্তি এক পাল মেয়ে, তার মধ্যে ছেলেও আছে আবার...'

'ছেলে না যুবক ?'

'যুবক। তোমার যেমন বুদ্ধি! ছেলেরা যাবে কেন মেয়েদের ঝামেলায় শুনি ? ইস্কুল নেই তাদের ? পড়াশুনা নেই ? বাল্যকাল থেকেই এঁচোড়ে পাকবে নাকি তোমার মতন ? তাছাড়া, মেয়ের সঙ্গে ছেলের ভ্যাজাল কেউ ভালোবাসে ? হ্যাঁ, কী বলছিলাম ? মেয়ের পাল বটে কিন্তু এক দঙ্গলে নয় সবাই। হলের এখানে-ওখানে জড়িয়ে-ছড়িয়ে। আর প্রত্যেক মেয়ের পালে একটি করে যুবক।'

'উঁহু, যুবক না, পালোয়ান।'

'পালোয়ান কি না জানিনে, তবে আমরা সেই পালোয়ানির মাঝখানে গিয়ে পড়লাম। মিষ্টার মিত্র তো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন আমাদের দেখে। নিজের পালা থামিয়ে এগিয়ে এলেন...এসে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন, নমস্কার প্রিসিলা দেবী, এসো ভাই রুচিন। রুচিনের কাছে আপনার কথা বহুৎ শুনেছি। আপনি এসেছেন আমার কী সৌভাগ্য !'

আমি বললাম, বাবুলু বাবু, দয়া করে যদি আগে আমার থাকবার ঘরটা একবার দেখিয়ে দেন···

'ঘরে পা না দিতেই ঘর্ঘরধ্বনি কেন ?' অবাক্ হয়ে আমি শুধাই। —'ঘরণী হবার সাধ নাকি রে ?'

'তোমার যেমন কথা! সে রাত্তিরে যে আর ফেরা যাবে না সেখানকার হালচাল দেখেই মালুম হয়েছিল। কাজেই

যেখানে শুতে হবে সেই দুর্গস্থলটা আগে থেকেই দেখে রাখা ভালো আমার মনে হোলো। তা ছাড়া, নিরামিষ জল্‌সা তো নয়! এধরণের মিশ্ররাগিণীর হৈ হুল্লোড় কত রাত অব্দি গড়াবে তার কি কিছু স্থিরতা আছে? একটু রাত না হলেই খাওয়া দাওয়া সেরে নিজের বিছানায় গিয়ে গড়াবার আমার মৎলব। বেশি রাত জাগা আমার পোষায় না বাপু।... তারপরে শোনো মেজমামা, নিজের ঘরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে একটুখানি প্রসাধন সুরু করেছি এমন সময় দড়াম্ করে দরজা ঠেলে এক আধবুড়ো ভদ্রলোক আমার ঘরে এসে ঢুকলো। সারা গা বেয়ে টপ্ টপ্ করে জল ঝরছে, মুখময় সাবানের ফেনা, আর লোকটা চ্যাঁচাচ্ছে এমন! তোয়ালে কোথায় গো, আমি দেখতে পাচ্ছিনা···বাবুল! বাবুল, কোথায় গেলে হে তুমি? এ কিরকম বাড়ি রে বাবা!···'

'বাড়ির এ-অংশটা,' আমি জানালাম·· 'এ-অংশটা হচ্ছে মেয়েদের তরফ্।'

'ও, তাই নাকি? জেনানা এলাকা? তাহলে লক্ষ্মী মেয়েটি! চট্ করে আমায় একখানা তোয়ালে দাও তো!' কাতরস্বরে ককিয়ে উঠলো লোকটা···'দেখচো না, ফেনায়িত হয়ে আমি অন্ধ বনে গেলাম!'

শোনো মেজমামা! আমি লক্ষ্মী মেয়ে! এমন অপবাদ কেউ আমায় দিতে পারে? আর এই একজন অচেনা অজানা লোক আমার মুখের ওপর ঐ কথা বলে পার পেয়ে যাবে? একটা ভিজে জ্যাবজেবে তোয়ালে বেছে না নিয়ে···ছুড়ে দিলাম ওর ঘাড়ে। এদিকে হয়েছে কি, সোরগোল না শুনে বাবলু আর রুচিন এসে হাজির। তারা ছুটে এসেছিল আমার ঘরে··· হাঁপাতে হাঁপাতে···প্রিসিলা দেবী, ব্যাপার কী, কী হয়েছে?

জিজ্ঞেস করলো বাবলু। তুমি জখম হয়েছো নাকি? জানতে চাইলো রুচিন। আমি বললাম, কিছুই হয়নি, দয়া করে যদি এই পাগলটাকে নিয়ে যান এখান থেকে। কিন্তু পাগলের দিকে তাকাতেই তারা যেন বোবা মেরে গেল। কাঠের পুতুল বনে গেল যেন। ঠোঁটে আঙুল চেপে বলল···চুপ চুপ! জানো ইনি কে? ইনি হচ্ছেন আমাদের নবাব···নবাব কর্ণেল আহ্ সান্ হাবীব্।'

'বাবা, এমন শান্‌বাঁধানো নাম কখনো শুনিনি।' এতক্ষণ রুদ্ধনিশ্বাসে ওর গল্প শোনার পর আমি হাঁপ ছাড়লাম।···

'বাবলু বল্ল আমায়, নবাবসাহেব দয়া করে আমার আতিথ্যস্বীকার করেছেন। আমাদের চীফ গেস্ট্ উনি। এই বলে সে শুক্‌নো একখানা পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে ঐ লোকটার মুখ চোখ নাক মুছে দিতে লাগল। মুছিয়ে টুছিয়ে বলল সে···কর্ণেল সাহেব, ভয়ঙ্কর দুঃখিত আমরা। আপনি দয়া করে আমাদের গোস্তাকি মাফ করুন···তাই না শুনে লোকটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো···বাবুল, রুচিন, তোমরা দু'জনেই আণ্ডার্ অ্যারেস্ট্। তোমাদের আমি গ্রেপ্তার করলাম। আপাতত তোমরা পরস্পরের হেপাজতে রইলে। তোমাদের সম্বন্ধে কী করা যায়···পরে বিবেচনা করা যাবে। তারপরে ওঁর নজর পড়লো আমার ওপর। পড়তেই যেন জ্বলে উঠলো ওঁর দু চোখ। 'বাবুল, এ তোমাদের কেমন ধারা ভদ্রতা? মহিলাটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে না? বাবলু তখন আমাদের পরিচয় দিল·· প্রিসিলা দেবী, ইনি কর্ণেল নবাব আহ্‌সান্ পাহ্ সান্ হাবীব্। আমাদের এখানকার ফৌজী কম্যাণ্ডার। আর ইনি হচ্ছেন কুমারী প্রিসিলা দেবী··· আমার বন্ধু রুচিনের বান্ধবী।···'

'কেন, ও ছাড়া কি তোর আর কোনো পরিচয় ছিল না?' আমি ফোঁস করে উঠি…'তুই কার ভাগ্নি তাও তো বলা যেতে পারতো?' রুচিন সম্মত হলেও…বলতে কি…বাব্লুর পরিচয়সূত্রপাত আমার তেমন রুচিসঙ্গত বোধ হয় না।

প্রিসিলা আমার বাধা মানে না…'হ্যাঁ! কম্যাণ্ডার যে তা গোঁফ দেখলেই বোঝা যায়। শিকারী বেড়ালের যেমন গোঁফ থাকে ঠিক তেমনি। কিন্তু মিলিটারী হলেই আমি কিছু ঘাবড়াবার মেয়ে নই। কর্ণেলসাহেব বাবলুদের দিকে ফিরলেন—বাবুল, রুচিন বাবু, তোমরা যাও এখন। তোমাদের আমি হল্ ঘরে ইন্‌টার্ণ করলাম। সেখানে তোমরা পরস্পরের ওপর কড়া নজর রাখবে। দুজনের কেউই যেন না পালাতে পারে, হুঁশিয়ার! শুনেই রুচিন আর বাবলু সেখান থেকে সরে পড়লো। তারপর ভদ্রলোকের নজর পড়লো আমার ওপর…'

'নেকনজর নিশ্চয়?' আমি শুধালাম।

'নেকনজর নয়, অনেক নজর। খালি ঘাড়ে তো নয়, ঘাড়ের ওপরে নীচে চারিধারে। সর্বত্র সমদৃষ্টি। অনেকক্ষণ ধরে নজর দিয়ে খুটিয়ে খুটিয়ে তিনি দেখতে লাগলেন আমায়…'

'তুই তার নজরবন্দী হলি বল্।' আমি বলি।

'দেখে টেখে অবশেষে একটু হেসে তিনি বল্লেন, এমন খুপ্‌সুরৎ মেয়ে আমি জন্মে দেখিনি। তুমি দাঁড়াও তো, মা-লক্ষ্মী, আমার পোষাকটা পরে নি। তারপর তুমি আমার সঙ্গে খাবে…কেমন? আমার টেবিলে বসে একসঙ্গে…কি বলো? আমার সঙ্গে খেতে তোমার কি আপত্তি আছে? আমি বললাম—না না, আপত্তি কিসের! আপনার মত বিখ্যাত লোকের সঙ্গে এক টেবিলে খেতে বসা তো সৌভাগ্যই! শুনে

তিনি বল্লেন, বাঃ, তুমি তো কথাও কইতে শিখেছো বেশ! দিব্যি চৌকোস মেয়েই দেখছি···'

'কথা কইতে শিখবে না? কার ভাগ্নি? সেটাতো দেখতে হয়?' সগর্ব না হয়ে আমি পারি না।

'তারপর আহার-পর্ব। খাবার কথা আর কী বলবো মেজ মামা! এত রকমের আর এমন ধারার খানাপিনা আমি জীবনে খাইনি। অবিশ্যি, খালি খানার দিকেই আমি ছিলাম। পিনার ধারে কাছেও ঘেঁষিনি।'

'যারা পিনার দিকে এগোয়, শুনেছি, তারা শেষে নাকি খানার মধ্যে গিয়ে পড়ে।' আমি জানাই।

'অবশ্যি, পানের ব্যাপারটা ভালো করে জমলো খানা টানা খতম্ হবার পরেই। তখনি তো সুরু হোলো নাচ গান হুল্লোড়। আমি মাথা ধরেছে বলে বাবলুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কেটে পড়লাম। সেখান থেকে সটান্ চলে এলাম নিজের বিছানায়। কিন্তু শুলেই কি ছাই ঘুম আসে? বিশেষ করে নীচের তলায় যদি ঐ রকম হৈ হল্লা চলে? তবু ওরি মধ্যে কখন্ চোখের পাতা বুজেছি, একটু তন্দ্রামতন এসেছে আর খুট্ করে একটা আওয়াজ হোলো। ঘরের মধ্যে পায়ের শব্দ পেলাম যেন কার? তাহলে কি শোবার আগে দরজায় আমি খিল দিইনি? বুদ্ধি করে একটা টর্চ নিয়ে এসেছিলাম, বাতিটা জ্বেলে দেখতে গেলাম···জ্বালতেই যা চোখে পড়লো তাতে তো আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া!'

'ভূত নাকি রে?' আমিও শিউরে উঠি।

'ভূত হলে তো বাঁচতাম মেজমামা। আল্‌খাল্লা-পরা, লম্বা দাড়ি, কিম্ভূত-কিমাকার চেহারার কে যেন! আমার দিকে মিটমিট করে চাইছে···'

'তাহলে ভূত নয়। নিশ্চয় বেহ্মদত্যি! তা না হয়ে যায় না।'

'কিন্তু দাড়ি লাগালে কী হবে? দাড়িতে কি আর ঢাকা পড়ে? গোঁফ দেখলেই চেনা যায় যে। শিকারী বেড়াল চিনতে কি কারো দেরি লাগে? আমি গর্জে উঠলাম···যান্, যান্ আপনি আমার ঘর থেকে। আপনার···আপনার সাহসকে

বলিহারি! স্পর্দ্ধাও বড় কম নয় তো? এক্ষুনি…এক্ষুনি যান আপনি আমার এখান থেকে।'

'সেই নবাব কে যেন? তিনিই বুঝি? কী নাম যেন না?…" নামটা আমার ভালো মনে আসে না, বেশ শাণিত এক নাম, তার মধ্যে আবার আহা উহুর ছড়াছড়ি আছে, এইটুকুনিই খালি

মনে পড়ে…'কী নাম বল্লি ভদ্রলোকের? নবাব কেরামতুল্লা না কী?' কেরামতি দেখে সেই রকমই আমি আন্দাজ পাই।

'শ্রীমতী প্রিসিলা, লক্ষ্মী মেয়েটি, তুমি ভয় পেয়ো না। যা ভাবছো আমি তা নই।' বল্‌ল সেই ছদ্মবেশী কিম্ভূত: 'তুমি স্বপ্ন দেখছো কি না! সেইজন্যেই ঠিক ধরতে পারছো না। আমি হচ্ছি…'

'আমি মোটেই স্বপ্ন দেখছি না, বেশ সজাগ আছি…দিব্যি টন্‌টনে জ্ঞান রয়েছে আমার। খুব টের পেয়েছি আপনি কে…'

'আমি…আমি হচ্ছি স্বপনবুড়ো! স্বপ্নের মধ্যে যে বুড়ো এসে দেখা দেয় আমি—আমি হচ্ছি সে-ই।'

'স্বপনবুড়ো ফুড়ো জানি নে।' আমি তেড়েফুঁড়ে উঠি… 'আপনি যাবেন কি না আমার ঘর থেকে? এক্ষুনি যান নইলে…'

'তুমি কেমনধারা মেয়ে গা! স্বপনবুড়ো না জানো, ব্রহ্মা তো জানো? তোমাদের ব্রহ্মদেব? পরমব্রহ্ম যার নাম গো! তোমার পরাকাষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে সে-ই আমি এখানে এসেছি, এসে আবির্ভূত হয়েছি তোমার সম্মুখে। এখন বৎসে, কী বর চাও বলো তো? তুমি বর প্রার্থনা করো। আমি তথাস্তু করে দেব।'

'বলেছি না যে বেহ্মদত্যি?' আমি বলি 'তা না হয়ে কী যায়? না হয় তোর বেহ্মদেবই হোলো…সে একই কথা। দেব-দত্যি-দানা সব এক। সেই এক ব্রহ্মই। সবারই সমান বর্বরতা। তা, বেহ্মদেব কী করলেন তারপর?"

'বর নেবার জন্য ভারী পীড়াপীড়ি করতে লাগলো আমায়।'

'করবেই, জানা কথা। শাস্ত্রেই লেখে, ব্রহ্মা চতুর্মুখ… মুখের দিকেই তাঁর চাতুর্য। ওঁর কাজই হচ্ছে বর দেয়া। কনেদের বর দান করা, আর বরদের কনের কাছে নিয়ে গিয়ে কোণঠাসা করা।'

'কিছুতেই ছাড়ে না আমায়, নিতেই হবে একটা বর—'

'প্রজাপতির নির্বন্ধ···যাবি কোথায়?' আমি বলি···'ওর থেকে কি রেহাই আছে কারো?'

'ফের যদি আপনি এখানে বড়র বড়র করবেন তাহলে আমি চেঁচাবো বলছি—এই বলে আমি লাফিয়ে উঠি। টর্চ হাতে বিছানায় বসে বক বক না করে উঠে গিয়ে ঘরের আলোটা জ্বালাই। নাঃ, লোকটার ঐ বর্বরপণা আর বর্দাস্ত করা যায় না।

তারপর আলো জ্বালতেই সব পরিষ্কার। আমি বললাম··· 'কর্ণেল সাহেব, চালাকি পেয়েছেন? আপনার লম্বা দাড়ি দিয়ে ভোলাবেন এতটা আনাড়ি আমায় পাননি। যতই ছদ্মবেশ ধরুন আর যে-আল্‌খাল্লাই পরুন, আপনার মৎলব আমার কাছে জলের মতই প্রাঞ্জল।' তখন মুখ কাঁচুমাচু করে নবাব সাহেব তাঁর আলখাল্লা গুটিয়ে দরজার দিকে এগুলেন। যাবার সময়ে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন একবার। গদ্‌গদ কণ্ঠে বললেন, 'আস্‌মানের হুরী, আমি এসেছিলাম তোমার গোলাপ কুঁড়ির মতন আঙুলে আমার এই আংটিটা পরিয়ে দিতে, কিন্তু তুমি যখন কিছুতেই বর নিতে রাজি নও···বলে তিনি আর কিছুই বললেন না, তাঁর হাতের আংটিটাই বললো। ঝক্‌মক্ করে চেঁচিয়ে উঠলো আংটির হীরেটা। আমার মুখের ওপরে। তখন, এগিয়ে যেতে হোলো আমাকেই—বাধ্য হয়েই। আংটিটা দেখবার জন্যেই। তিনি আমার হাতখানি নিজের হাতে নিলেন, নিয়ে সযত্নে ওটা আমার আঙুলে পরিয়ে দিলেন। দিয়ে বললেন··· খানার সময়ে যেমন করে তাকাচ্ছিলে তুমি এটার দিকে, তাতে আমার মনে হোলো আংটিটা তোমার মনে ধরেছে। নজরে লেগেছে তোমার। ভাবলাম এ-জিনিস তো তোমার হাতেই বেশি মানায়, তুমি যখন ঘুমোবে তোমার হাতে আমি পরিয়ে আসবো, কিন্তু তুমি যে জেগে জেগে ঘুমোচ্ছিলে তা কি করে

জানবো ? তাছাড়া, যেরকম করে উঠলে আমার নাতনিও সেরকমটি করে না। যাক, এখন তো সব জলের মত পরিষ্কার হোলো ? হোলো তো ? বলে নবাব সাহেব তাঁর আল্‌খাল্লা ঝলর মলর করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আচ্ছা, মেজমামা, এর মানে কি ? বলো তো ? এটা কি উনি অপত্যস্নেহেই আমায়···?'

'স্নেহ মানেই অপথ্য, অখাদ্য! সেকথা তুই আমায় বলবি ?' আমি বলি···'জলের সঙ্গে মিশ্‌ না খেলেও স্নেহ-পদার্থের সবটাই জলাঞ্জলি। এতো একেবারে জলের মতই পরিষ্কার।' বলে ওর অঙ্গুলিগত জ্বল্‌জ্বলে সত্যটাকে আমি যেন দিব্যচোখে দেখি। আংটিটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়। হীরকখচিত হাতের দিকে চেয়ে সেই খচিত-HERO-র দৃশ্য চোখে ভাসে। কাঁচ কাটাই তো হীরের কাজ ? হায়রাণ-পরেশান্‌-সাহেবের কাঁচা কাজের দিকে আমি তাকিয়ে থাকি। ..

'আংটি তো দেখলাম, কিন্তু তোকে দেখা যাচ্ছে না কেন ?' একটু থেমে আমি বল্লাম।

—'আমাকে দেখা যাচ্ছে না তার মানে ? এই তো আমি।' প্রিসি একটু বিস্মিত হয়।

'কাল বিকেল থেকে তোকে নাকি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সুশীলাদি বল্লো যে ? একটু আগেই এসেছিলেন তোর খোঁজে ?' আমি শুধালাম : 'ছিলি কোথায় সারা রাত্তির ?'

'হাজতে। থানায়।' প্রিসিলা অম্লানবদনে জানায়।—'পুলিসফাঁড়িতে রাত কেটেছে কাল—একটা ফাঁড়াই গেছে।'

"বলিস্‌ কিরে ?" নিজের কানকে প্রত্যয় হয় না। থাকবার মত এ-পৃথিবীতে নানান্‌ স্থানাস্থান আছে জানি। কিন্তু

থানা-স্থান যে তার মধ্যে একটা, একথা কোনোদিন আমার মনে হয়নি। হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা নেই, কলম হাতে হাঁ করে থাকি।

'এত জায়গা থাকতে থানায় থাকতে গেলি যে? থাকবার আর জায়গা পেলিনে? হাজতে কখনো যায় মানুষ?'

বাধ্য হয়ে কালেভদ্রে যায় যদি বা, সাধ করে কেউ যায় কখনো? পুলিসের হেফাজতে যাবার সখ হয় ভদ্রলোকের? যে-খোঁয়ারে পৌঁছবার পর থেকেই খোয়ার সুরু, আর শেষে গিয়ে জেল ফাঁসি হয়ে খোয়া যাবার ভয়—সেখানে—প্রিসির মত ফ্যাশনেব্‌ল্‌ মেয়ে—ভদ্রমহিলাই বলা যায়—নাঃ, আমি আর ভাবতে পারি না।

'গেলি তো গেলি! দিদিকে বলে গেলিনে কেন?'

'বলবার ফাঁক পেলেতো? হিতেন এসে এমন তাড়া লাগালো যে...ওর জন্যেই তো যেতে হোলো হাজতে!

'হিতেন! হিতেন নামক এই অহিতকর বস্তুটি কে?' তাকিয়ার ওপর ভর দিয়ে ওর দিকে আমি তাকাই।

"আমার সঙ্গে পড়তো স্কটিশ চার্চে। এক সঙ্গেই পড়তাম। আমার সমবয়সী—কি দুয়েক বছরের বড়োই হবে, সেই কলেজের সময় থেকেই আমাদের ভাব।"...প্রিসিলা সুরু করলো বলতে ..

'সেই হিতেনের সঙ্গে সেদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেলো—লাইটহাউসে ছবি দেখতে গেছি...এই তো ক'দিন আগের কথা...'

আমি ওর হিতকথায় কান দিলাম।

'সন্ধ্যের টিকিট কেটেছি—ছবি সুরু হতে দেরি তখনো—হাউসের লবিতে ঘুরছি, এমন সময় এক যুবক আচমকা এসে মিলিটারি কায়দায় বেঁকে দাঁড়ালো আমার সামনে—'আরে এ কে? আমাদের মিস্ প্রিস্ না?' বলেই সে চক্ষের পলকে আমার—চুলের গোড়া থেকে পায়ের গোড়ালি অব্দি আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে নিলো—হ্যাঁ, সেই তো! সে ছাড়া আর কে? সেই প্রিসিলাই! ঠিক সেইরকমটিই রয়েছো দেখছি! কোথ্থাও কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেনি। বরং খুঁটিয়ে দেখলে কোথাও কোথাও কিছু কিছু শ্রীবৃদ্ধিই হয়েছে বলতে হয়।'

'ছাড়ো ছাড়ো—কী হচ্ছে কী!' বলে ওর থাবার ভেতর থেকে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম—বলি, মশাই নো-পাত্তা, কোন্ মুল্লুকে ছিলেন আপনি অ্যাদ্দিন? আমায় কফি হাউসে আসতে বলে সেই যে তুমি ডুব মারলে—প্রায় বছর

দু'য়েক আগেই না ? তারপর আর তোমার কোনো খবরই নেই একদম্ !'

'ফেরারী আসামী ফিরে এলে কি এমনি করেই অভ্যর্থনা করে ?' বলে সে আমাকে টানতে টানতে কাছাকাছি এক খাবার-ঘরে নিয়ে চললো—'সেদিন আমি আসছিলাম কফি হাউসে। আসতামও ঠিক—এসেই বিয়ের কথাটা পাড়তাম—কিন্তু এলাম না কেন জানো ? ভয় হোলো, পাছে তুমি রাজি হয়ে যাও, হাঁ করে বসো এক কথায়, সেই ভেবেই—ভেবে চিন্তে আমি আর এগুলাম না।'

'আহা, আমায় তেমন হাঁ-করা মেয়ে পাওনি ? তোমায় বিয়ে করতে আমার বয়েই গেছে ! অবশ্যি, পৃথিবীতে যতো অপদার্থ ছেলে আছে তুমি তাদের কারো চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নও। এবং সত্যি বলতে, তোমাকে আমি এখনো আর সব আজেবাজে ছেলের চেয়ে একটুও কম অপছন্দ করিনে, কিন্তু মশাই, এই দু' বছর ধরে কোথায় ডুব মারা হয়েছিল জানতে পারি কি ?''

'জানবার কী আছে ?' আমি জানাই।—'ডুবন্ত লোকেরা বাঁচবার চেষ্টায় যেমন কুটো ধরে, কূট-মনারা তেমনি—সেই চেষ্টাতেই—ডুব মারে ! বৃথা চেষ্টা হলেও—আত্মরক্ষার কূটনীতিই এই।' বলে আমি প্রিসিলার দিকে কুটিল দৃষ্টিতে চেয়ে রহস্যটা সরল করার চেষ্টা করি।

'নিশ্চয় পারো।' জবাব দিলো হিতেন—'বিয়ের ফাঁড়াটা কাটাবার পর সটান্ গিয়ে দেশরক্ষা-বাহিনীতে যোগ দিলাম। মানে, যাকে বলে—এক ঢিলে দুটো পাখী মারা গেল—দেশরক্ষা আর আত্মরক্ষা করলাম—এক দৌড়ে।'

'ছেলেটিকে গুণী বলেই বোধ হচ্ছে।' আমি গুন্ গুন্ করি।

'যাক্ সে সব কথা। যেতে দাও।' বলে নতুন কথা পাড়লো সেঃ 'শোনো এখন। স্কটিশের প্রাক্তন ছাত্রেরা মিলে—ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রীরাও জড়িত—মানে, আমরাই আর কি—একটা গ্র্যাণ্ড পার্টি দিচ্ছি। আসবে তুমি সেই পার্টিতে ?' হিতেন আমায় শুধালো। পার্টির কথায়, মেজমামা, মিথ্যে বলব না, আমি যেন লাফিয়ে উঠলাম। দেশটার যে কী দশা হয়েছে—রেশন আর কিউয়ের ঠ্যালায় পার্টি ফার্টি যেন উঠেই গেছে এদেশ থেকে...'

'ভোজ টোজ সব ভোজবাজি।' আমারো অনুযোগ শোনা যায়।

'পার্টি বলতে শুনি খালি কমিউনিস্ট্ পার্টি আর কংগ্রেস পার্টি। আসল পার্টির নাম গন্ধই নেই। যাবো বই কি, নিশ্চয় যাবো পার্টিতে।' ওকে আমি কথা দিলাম—কিন্তু কবে—কখন—কোথায় ? সে সব তো আমায় জানতে হবে ?

হিতেন বললে—'আমাদের বকুদার বাড়িতে। সে ছাড়া এই বাজারে পুরণো বন্ধুদের খাওয়াবে এমন বোকা আর কে আছে ? আর, ধরে বেঁধে না খাওয়ালে কেই বা তার বকুনি শুনতে যাবে ? আর কবে হবে, তা জানতে চাও ? আসছে চড়ক সংক্রান্তির দিন।'

বছরের পয়লা দিনে না হয়ে শেষ তারিখে হবে শুনে আমি একটু অবাক হলাম। ও বললে, নববর্ষের প্রথমে তো সবাই করে—সে-উৎসবে আর নতুনত্ব কী ? আমাদের এটা হচ্ছে পুরণো বছরকে বিদায়ী অভিনন্দন কিংবা একটা পার্টিং কিক্‌ও বলতে পারো।'

'বেশ, আমি তাহলে তৈরি থাক্‌বো। তুমি এসে নিয়ে যেয়ো

আমায়, কেমন ?' হিতেন বললে—'হ্যাঁ, তৈরি হয়ে থেকো। কিন্তু ঐ তৈরি হওয়ার মধ্যে একটু ইতরবিশেষ আছে।'

'কেমন ইতর, কিরকম বিশেষ শুনি ?' আমি জানতে চাইলাম। আগে ভাগেই জেনে রাখা ভালো। ইত্রমো কিছু থাকলে কোনো ভদ্র মেয়ের তার ভেতরে মাথা গলানো উচিত কী ? তুমিই বলো না মেজমামা ?'

'সেকথা বলতে !' আমি বলি : 'তাতে গালমন্দের কারণ ঘটে। খালি যে গালের ওপর দিয়েই যায়, তাই না, তার চেয়েও মন্দ ব্যাপার ঘটতে পারে। পার্টির আসল পার্টটা জানা দরকার আগে।'

'হিতেন বললে, মানে, এটা আমাদের ছোটদের আসর বসবে কি না। ছোট্টছোট্ট ছেলেমেয়ের জমায়েৎ ! কিন্তু ছোট্টরা কেউ থাকবে না তার ভেতর—ষ্ট্রিক্ট্লি ফর্বিড্ন্। থাকবে যতো বুড়ো ধাড়ি। শ্রীমান্ আর শ্রীমতী—এই আমরাই ! ছেলেবেলার পোষাকে—হাফ প্যাণ্ট্ আর ফ্রক্ পরে ছোটদের ছদ্মবেশে হাজির হবো।'

ও, এই কথা ! তক্ষুনি রাজি হয়ে গেলাম। তারপর রাত ন'টা অব্দি সেই খাবারঘরে বসে খেতে খেতে আগামী পার্টির যতো খুটিনাটি নিয়ে আলোচনা চললো আমাদের।'

'ছবি দেখলি নে ?' আমি অবাক হই—'ছবি দেখতে গিয়ে—টিকিট্ ফিকিট্ কেটে—'

'কই আর দেখলাম। দেখতেই দিলো না ও। বললে, অনেকদিনের পর দেখা। ছবি দেখে কেন সময় নষ্ট করা ? তার চেয়ে বসে বসে তোমার ছবিই দেখা যাক্ ততক্ষণ।'

'তা, দেখবার মতো ছবি একখানা বটে।' হিতেনের কথায়

আমাকে সায় দিতে হয়—'নিতান্ত গর্হিত কথা বলেনি হিতেন। ছোক্‌রাকে সমঝ্‌দার বলেই বোধ হচ্ছে।'

'তুমিই আমার মাথাটা খেলে মেজমামা!' প্রিসিলা মিষ্টি করে হাসলো—'মা বলেন মিছে না। মাটিতে যে আমার পা পড়ে না সে এই তোমার জন্যেই।'

'তারপর, পার্টিতে তোর পা পড়লো তো?' মাথা খাবার কথাটা আমি চাপা দিই। মানুষ স্বভাবতই নিজের প্রশংসায় সলজ্জ। একটু ব্রীড়াবনতই। বড়ো বড়ো খাইয়েও নিজের ভোজননৈপুণ্য স্বকর্ণে শুনতে নারাজ।

—'মানে, ইতর-বিশেষের সমস্যাটা কি করে মেটালি তাই আমি জানতে চাইছি।' নিজকীর্তির কীর্তনে আমি বাধা দিই।

'ছোটবেলাকার আমার ফ্রক্‌ ট্রক্‌ সমস্তই তোলা ছিল—তুলে রেখেছিলাম যত্ন করে প্যাঁটরায়। আমার খ্যাল্‌না ট্যাল্‌না পুতুল টুতুলের সঙ্গে। জানি কখনো পুতুলখেলার দিন ফিরবে না এজীবনে, ফ্রক্‌ আর পরবো না—কিন্তু সখ তো করে। সাধ তো হয় যে ফের আবার সেই হারানো দিনগুলি ফিরে আসুক। ফ্রক্‌ পরে বেণী দুলিয়ে বেলতলা গার্লস্‌ স্কুলে পড়তে যাই আবার। সেসব দিনের কথা ভেবে কতো যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছি—কতোদিন! হায়, আর কি সেসব দিন আসবে!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বার করলাম ফ্রক্‌গুলো। জম্‌কালো রকম একখানা বাছলাম তার থেকে। সেই যেখানা তুমি আমার জন্মদিনে দিয়েছিলে—বেজায় রঙচঙে—যেটা পরলে রাস্তার কুকুররাও মুখ তুলে তাকাতো আমার দিকে। সেইটেই পছন্দ করা গেল। পরে দেখলাম, ফিট্‌ করে বেশ! এখনো। অবশ্যি একটু আঁটো সাটো যে হয় না তা নয়—তা হোক, হোক্‌গে। এধারে ওধারে এক আধটু টেঁকেও নিতে হোলো।

তাহলেও জিনিসটা নতুনের মতই ছিলো একেবারে। দেখাতুম তোমায়। কিন্তু একটু আগেই আমার এক বন্ধুর বাড়ি ওখানা ছেড়ে তার শাড়ি পরে আসছি যে—?'

'বেশ করেছিস্—তারপর? ফ্রক্‌টা টেঁক্‌সই করবার পর?' শোনবার আমার তর্ সয় না।

"শাম্পু করে মাথার চুল হু' ভাঁজ করে বিনুনি করলুম। ছড়িয়ে দুলিয়ে দিলুম দুধারে—ছোট্ট মেয়েরা যেমন করে দোলায়। এই সব সারতে সুরতেই বিকেল হোয়ে গেল। হিতেন এসে হাজির একেধারে কাঁটায় কাঁটায়।...হাফ শার্ট আর হাফ প্যাণ্টে ওকেও মন্দ মানায়নি। সবই প্রায় ঠিক আগের মতই, কেবল ওর চৌকস গোঁফ জোড়া যা একটু বেমামান ঠেক্‌ছিল।'

'গোঁফ হচ্ছে ফৌজী আদব। পরস্পরের প্রতিনমস্কারের এক কায়দা। তুম্‌ভি-মিলিটারী-হাম্‌ভি-মিলিটারী গোছের কাণ্ড আর কি!'—ব্যাখ্যানা করি আমি।

'ইস্! দেখতে যদি তুমি আগেকার পোষাকে আমায়। ঠিক বেলতলা গার্লস্ স্কুলের খুকীটির মতোই হয়েছিলাম। আমাকে দেখেই উছ্‌লে উঠলো হিতেন—মরি মরি! কতকালের চেনা এ রূপ! এর জন্যে ন্যাড়া মাথা নিয়ে এই হাফপ্যাণ্টে কতোদিন যে ঘুরেছি বেলতলায়। অভাগার দিকে ফিরেও তাকাতে না তখন।'

'কাকস্য পরিবেদনা!' বেণী দুলিয়ে আমি বল্লাম, 'বেল পাকলে কাকের কী! ন্যাড়া মাথা নিয়ে বেলতলায় কেউ যায়?'

'সেই বেলাভূমির কতো ঢেউই না গুণেছি একদিন।' বলে সে ফোঁস করে উঠলো। —'যাক্, তার একটা ঢেউ

অন্ততঃ এই বালুতটে এসে ভেঙেছে। আমার হাতের নাগালে এসেছে আজ।'

'হায়রে, নাগালে আছে তারা চিরদিনই—' আমার শ্রীধর-ভাষ্য প্রকাশিত হয়ঃ 'তবে গালে না এলে ঠিক আঁচ মেলে না। আর, না আঁচালে তো বিশ্বাস নেই।'

'হিতেন একটা মোটর-সাইকেল নিয়ে এসেছিল। তার কোন্ এক বন্ধুর—না কার—না বলে ধার করে এনেছে বললে। তার পেছনের ক্যারীয়ারে আমি চাপলাম। হিতেন বসলো সামনের সীটে। আর আমাকে বল্লো—ওকে পাকড়ে থাকতে। আহা, আমি যেন কচি খুকী! সামান্য মোটরবাইকে বসে নিজের তাল সামলাতে পারব না। ওর গায়ে-পড়া অকারণ মুরুব্বিয়ানার

প্রতিবাদ না করে পারলাম না। ও বল্লে, আহা, তাই কি আমি বলেছি? হাওয়ার ধাক্কার সবখানিই তো আমাকে লাগছে, তার চোটে বেসামাল হয়ে আমি নিজেই পড়ে যেতে পারি তো?

তাই তোমাকে বলছিলাম আমাকে ধরে রাখতে—যাতে আমি হঠাৎ না পড়ে যাই। যাতে আমার ব্যালান্স থাকে।'

তখন বাধ্য হয়ে অধঃপতনের হাত থেকে ওকে বাঁচবার জন্যই ওকে আমার ধরতে হোলো। দু'হাত দিয়েই ধরলাম। বলব কি, যা ছুট্ লাগালো বাইকটা—আর যেরকম হাওয়ার জোর—তার ধাক্কায় পাছে বেচারী পড়ে যায় তাই বেশ শক্ত করেই ওকে ধরতে হোলো।

'তারপর ? হস্তগত করবার পর ?' আমি প্রিসিকে শুধাই।'

'সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউর কফিহাউসের কাছ বরাবর আমরা এলাম। আসতেই সে বললে—এসো. এক পেয়ালা কফি খেয়ে নেয়া যাক্, খেয়ে দেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে নি। পার্টিতে আধমরা হয়ে পৌঁছোনোর কোনো মানে হয় না।

কফির সঙ্গে কাজু বাদাম, পটাটোচিপস্, চিকেন্ স্যাণ্ডউইচ্ এসে পড়লো—একটার পর একটা। খেতে খেতে সন্ধ্যে উৎরে গেল। খেয়ে টেয়ে চলনসই রকম চাঙ্গা হয়ে বেরুলাম, বাইরে বেরিয়ে দেখি—যা দেখলাম—আমাদের চক্ষু একেবারে চড়কগাছ! ..'

'চড়কসংক্রান্তি ছিলো না কাল্‌কে ?'...প্রিসিলাকে আমি স্মরণ করিয়ে দিই—'তারই একটা দেখলি বুঝি ?'

দেখলাম স-পাহারোলা এক পুলিশ অফিসার হিতেনের মোটর সাইকেলটাকে অ্যারেস্ট্ করেছে।...আমরা এগুতেই অফিসার ভদ্রলোকটি বলে উঠলো—ও, তোমরা ? তোমরাই বুঝি সেই মহাপাত্র ? বাপমাকে কাঁদিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছো—তোমরাই ? বটে ?'

'মাইজী এইসা রোতেহেঁ হুজুর।' পাহারোলাটা সায়

দিল তাঁর কথায়—'কেয়া কহেঙ্গে! যেতনা বখৎ থানামে আঁয়ে উন্‌কো আঁখ্‌সে '

'কেবল বাড়ি থেকে পালানোই নয়'—পুলিশ সাহেবটি বললো—'তার ওপরে, চোরাই মালের হেফাজতে থাকা, অ্যাজ্‌ ফর্‌ একজাম্পল্‌, এই মোটর বাইক। এই বলে এক জাম্পে তিনি আমাদের সামনে এগিয়ে এলেন—'এসো এখন.... আমাদের সঙ্গে চলো। খুকীর ভার আমি নিচ্ছি। আউর লছমন সিং, ইস্‌ বাচ্ছাকো তুম্‌হি সাম্‌হালো।'

'বল্লেই হোলো?' বলে উঠলো হিতেন, 'কোন্‌ আইনে আপনারা আমাদের পাকড়াচ্ছেন শুনি? আমাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলে কিছু নেই নাকি? ফাণ্ডামেণ্টাল্‌ রাইট্‌স্‌ নেই আমাদের? যদিও সেই রাইট্‌গুলি যে কী তা এখন আমার মগজে ঠিক আসছে না, কিন্তু তাহলেও, মনে না পড়লেও, আমি জানি ফাণ্ডামেণ্টাল্‌ রাইট একটা আছেই। আছেই আমাদের।'

'হেবিয়াস্‌ কর্পাস্‌।' হিতেনের কথায় জোর দেবার জন্য ঐ ভারী কথাটা আমি পাড়লাম। ফাণ্ডামেণ্টাল্‌ রাইটের মধ্যে পড়ে কিনা জানিনা, তবে খবর কাগজের দৌলতে ঐ কথাটা আমার জানা ছিল।

'হেবিয়াস্‌ কর্পাস্‌? সে তো ঢের পরের কথা—এখন তো তোমরা থানায় চলো।' কিরকম হেভি, দেখা যাক আগে।' এই বলে কর্মচারিটি আলগোছে আমায় তাদের পুলিস ভ্যানের উপরে তুলে নিলো। হিতেনকে তুলতে হোলো না, নিজেই সে সুড় সুড় করে উঠলো। পাকড়াও হয়ে বাইকটাও সঙ্গে সঙ্গে চল্লো আমাদের।

থানায় নাকি এক হাপুস্‌নয়নী আমাদের জন্যে বসে আছেন হাঁ করে। আমরা যেতেই—আমাদের দেখেই না—তাঁর শোক

আরো যেন উথ্‌লে উঠলো—'অ্যাঁ? এরা কারা? এরা তো আমার নেড়ি গেড়ি নয়। এদের আমি চিনিনে, এরা আমার ছেলে-মেয়ে কেন হবে? এসব ভ্যাজাল কেন জোটাচ্ছেন বলুন তো? বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো বাজে ছেলেমেয়ে টেনে এনেছেন? কেন এনেছেন? ভ্যাজাল চালাবার আর জায়গা পাননি?' এই বলে মেয়েটা যা তম্বি করতে লাগলো পুলিশের সঙ্গে!

ভ্যাজাল ছেলেমেয়ে? আজে বাজে আমরা? শুনে যা রাগ হয় মেজমামা, কী বলবো! ইচ্ছে করে যে ওর অকৃত্রিম ছেলেমেয়েদের তখন একবার হাতে পাই। সেই নির্জলা রত্নদের ধরে ধরে চিবিয়ে খাই তাহলে।

সব শুনে টুনে পুলিশ বললে—'আপনার না হোক কিন্তু এরাও ফেরার। অন্য কোনো বাড়ীর পলাতক।' পুলিশ কর্মচারিটি থানার ইন্‌স্‌পেক্টরকে বাৎলালেন—'তবে মনে হচ্ছে এরা আলাদা জোড়া, এখন এখনই এদের ছাড়া চলবে না। এদের অভিভাবক কাল সকালে এদের খোঁজে আসতে পারেন। তাছাড়া, এই মোটর বাইক—'

ইন্‌স্পেক্টার শুধালেন—'যে-মোটরবাইক চুরি যাবার খবর আমরা পেয়েছি এটা কি সেইটেই?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তার সঙ্গে নম্বর মিলেছে—অবশ্যি, এটাও যদি ভুল নম্বর না হয়।'

'লেকিন সাব—' পাহারোয়ালাটা বড়কর্তাদের কথার মাঝখানে নিজের একটা কথা পাড়ে—'লেকিন দেখিয়ে তো। খোখাবাবুকে ইয়ে গোঁফ দেখিয়ে। ইতো হামরা সাচ্চা মালুম নেই হোতি। এতনো ভরি বাচ্চাকো এতনা বড়ি মোচ?'

'ঠিক বাত।' পুলিশ কর্মচারিটিরও সন্দেহ জাগে—'[illegible] গোঁফ—এই বা কেমন করে হয়?'

[illegible] হুজুর?' পাহারোলাটা উৎ[illegible] দেখায়।

হাত না দিতেই হিতেন আর্তনাদ করে ওঠে—'না মশাই, আমার সত্যিকারের গোঁফ। দস্তুরমতন গজানো।' বলে নিজেই সে টেনে টেনে দেখায়। নিজের গোঁফে তা দিয়ে দেখাতেও কসুর করে না।

গোঁফে তা দিয়ে সে পাহারোলাটাকে ভয় দেখায়,—'গোঁফ টান্‌নে আয়েগা তো হাম্ কাম্‌ড়ে দেগা।'

'বাপ্‌রে! বাচ্ছা নেহি তো, বিচ্ছু হ্যায়।' বলে তিন পা পিছিয়ে যায় পাহারোলা।

ইন্স্‌পেক্টারবাবু সাব-ইন্সপেক্টারকে সম্‌ঝে দেন।—'কিচ্ছু আশ্চর্যি নয় মশাই! দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে এমন অদ্ভূত অনেক কিছুই হচ্ছে—আক্‌চারই তো দেখা যাচ্ছে আজকাল! এখন তো খালি গোঁফ দেখছেন, এর পর দাড়িও দেখবেন। লম্বা লম্বা দাড়ি। এমন কি, এরপর খোকাদের ল্যাজ গজালেও আমি অবাক্ হব না। যাক্, আজ রাত্রের মতন ওদের কুঠরিতে পুরে রাখুন। শোবার জন্যে কম্বল দিন দু'খানা করে'। কাল সকালে ওদের আসল মা বাবার কেউ না কেউ খুঁজতে আসবেন নিশ্চয়—নিতান্তই যদি এরা ত্যজ্য-পুত্তুর না হয়।'

কম্বল দিয়ে মুড়ে আমাদের থানার কুঠরিতে পুরতে নিয়ে যাচ্ছে এমন সময়ে অদ্ভূত এক গলা বার করলো হিতেন। তাকে বালসুলভ চাপল্য বলতে পারো মেজমামা। ছোট্ট ছেলের মতন কচি গলায় আধ আধ বুলি করে বল্‌লো—আমার বোন

ভারী ভয়কাতুরে মশাই! আলাদা ঘরে একলাটি শুতে পারবে না। বলে উঠলো হিতেন।

'ভয়ের তো কোনো লক্ষণ দেখছি না ওর।' সাবইন্স্‌পেক্‌টার আমাকে লক্ষ্য করে বললেন।

হিতেনের কথায় এমন মজা লাগলো আমার! একটু হঠকারিতা হলেও, আমি ভেবে দেখলাম—থানার অন্ধকূপে কম্বল পেতে শুয়ে ঘুম তো আসবেই না—একলা একলা সারা রাত ঠায় জেগে থাকার চাইতে একঘরে দুজনে মিলে মজা করে গল্প করে কাটানো ঢের ভালো।

'খুকী, তোমার কি ভয় করছে নাকি?' ইন্‌স্‌পেক্‌টার আমায় শুধালেন।

'হ্যাঁ—ব—ব—বড্‌ডো।' ভয়তরাসে গলায় আমি বল্লাম।

'কুঠরির মধ্যে যেটা পরিষ্কার আর যেটায় পাখা আছে তাইতে বিছানা করে দাওগে—' বড়কর্তা হুকুম দিলেন পাহারোলাকে।

তাঁর কথায়, বলতে কি, আমি বেশ দমেই গেছলাম, কিন্তু তখনো তাঁর কথা ফুরোয়নি—

কথাশেষে তিনি বল্লেন—'আর হ্যাঁ, দুজনকেই এক ঘরে দাও।'

শুনে—তখন আমার ধড়ে প্রাণ এলো মেজমামার!

[পাঁচ]

উট চলেছে মুখটি তুলে

খারাপি যদ্দুর হবার হোলো, খুনটা হতেই বাকী রইলো খালি। ‘খুনখারাপি’-সম্পাদকের সঙ্গে বেশ এক চোট হয়ে গেল আমার।

ওঁর গোয়েন্দাকাহিনীর মাসিকে একটা ডিটেক্‌টিভ গল্প দিয়েছিলাম। পড়ে টড়ে উনি বললেন - কিস্‌সু হয়নি। ডিটেক্‌টিভ গল্প বলছেন, কিন্তু এর মধ্যে ডিটেক্‌সন্‌ কোথায়? ঘটনা কই? একটা ডিটেক্‌টিভও তো নেই। টিক্‌টিকির ল্যাজ দূরে থাক— টিকিও দেখা যায় না…

‘টিকটিকি না থাক, খুন তো আছে।’ ওঁর টিক্‌টিক্‌ করার প্রতিবাদে আমি বলতে যাই।

'হ্যাঁ, খুন আছে। কিন্তু তাই বলে যে এটা খুনের গল্প হয়েছে তা আমি বলতে পারব না, বরং বলতে হয়, গল্পটাকেই আপনি খুন করেছেন। খুনের সেই আবহাওয়া কই? খুনীর মনস্তত্ত্ব কোথায়? সত্যিকারের খুন বলে মনেই হয় না। খুনীকে মনে হয় যেন কলের পুতুল, লেখকের হাতের খ্যাল্‌না মাত্র। তার কোনো ব্যক্তিত্বই নেই। গল্পের খুনোখুনি, বস্তুতঃ না ঘটলেও, তার মধ্যে বাস্তবতার স্পর্শ তো থাকবে? তবেই না মশাই, পড়লে মনে হবে, হত্যাকাণ্ডটা সত্যিই বুঝি ঘটেছিল। নাঃ, যদ্দিন আপনি নিজে না একটা খুন করতে পারছেন তদ্দিন কোনো খুনের গল্পে আপনার হাত খুলবে না।' মহীশবাবু সাফ্‌ কথা বলে দিলেন শেষটায়।

আর, এই বলে নিহত গল্পটাকে তিনি আমার হাতে ফেরৎ দিলেন। নিমতলায় পাঠাবার জন্যেই মনে হয়। কিন্তু কথাটা ওঁর একদিক দিয়ে খাঁটি, আমি ভেবে দেখলাম। সত্যিই খুনের কোনো অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। ভালোবাসার অভিজ্ঞতা না থাকলে যেমন প্রেমের গল্প লেখা যায় না, খুনখারাপির বেলাও তার অন্যথা হবার কথা নয়। সম্পাদকের কথায় একটা আই-ডিয়া—বেশ উঁচুদরের আইডিয়াই—পেলাম, বলতে কি!

মামার তার পেয়ে তার পরদিনই আমাকে চলে আসতে হোলো কালিম্‌পঙ্‌। কি এক জরুরি কাজে তাঁকে নেপালে যেতে হচ্ছিল, তাঁর অবর্তমানে ফাঁকা বাড়ি আগ্‌লাবার পালা আমার।

মামা পালাতেই এক দিস্তে কাগজ নিয়ে বসা গেল। 'কালিম্‌পঙের খালি বাড়ি' বলে গল্প ফাঁদ্‌লাম একটা। ডিটেক্‌টিভ গল্পই। কিন্তু ফাঁদ্‌তে গিয়ে মহীশবাবুর কথাগুলো মনে বাধ্‌লো। ডিটেক্‌টিভ গল্পের কাঠামোটাই হচ্ছে আসল।

সেইটে ঠিকমতো বাঁধতে পারলে খুনটুনগুলো তখন আপনা থেকেই বাধ্য হয়, খুনীরাও অবাধে এসে ফাঁদে পা দেয়। বাধিত হয়েই আসে। অবশ্যি, কাঠামোর পরেও থাকে আরো। খুনের আবহাওয়া, খুনীর মনের ধারা—পুলিসের আড়াআড়ি—ইত্যাদি। এসব ব্যাপার থাকেই। কিন্তু কাঠামো না থাকলে গোটা গল্পটাই কাঠ হয়ে থাকবে।

কাঠামো ভাবতে গিয়ে এক আকাঠের কথা মনে পড়লো। গল্পের নাম পান্টালাম। বদ্‌লে করলাম—'সম্পাদক-সাবাড়।' প্লট্‌টা ভাঁজতে লাগলাম মনে মনে। মুগুরের মতই—ভাজতে ভাঁজতে—যেমন ঘাম বেরয়—তেম্‌নি ঘটনারা বেরুলো। ব্যায়ামের ফলে শিরা-উপশিরায় তাজা খুনরা খেলে যায়। তেম্‌নি আমার শীর্ষদেশে খুনের আবহাওয়া খেলতে লাগল। খুনুতব্য লোকটাও ক্ষুণ্ণমুখে দেখা দিলো আমার মাথায়। খুনীটাও যেন মাথা বাড়ালো। মগজের মধ্যে গজ গজ করতে লাগলো খুন-ও-খুনী। এক খুনোখুনি-ব্যাপার!

ফস্ করে একটা প্যাডের কাগজ নিয়ে চিঠি লিখলাম মহীশ-বাবুকে—'এখন বুনো হাঁসের মরশুম এখানে। কালিম্‌পঙের হাঁসের মাংস চেখেছেন কখনো? এমন খাসা চীজ হয় না। খাসা কোথায় লাগে মশাই! এহেন জিনিষ একা একা খেয়ে সুখ নেই। আপনি যদি দিন দুয়েকের জন্যে অবসর করে এখানে আসেন, এসে আমার সঙ্গে যোগ দেন খুব খুশি হবো। আসচেন তো? পুনশ্চ, নতুন একটা গল্প ফেঁদেছি, সেটাও আপনাকে শোনাতাম।...'

চিঠি ছেড়ে নিশ্চিন্ত রইলুম। জানি তো আমি, আমার যেমন হাসির দিকে—ওঁর তেম্‌নি হাঁসের দিকে দুর্বলতা। হাঁসের স্বাদ পাবার জন্যে চীনে রেস্তোরাঁর আশেপাশে ঘুরঘুর করে

বেড়ান—সে-খবরো আমার অজানা ছিল না। ডাকুরোস্‌টের নামে হাঁক ছাড়লে ফেরৎডাকেই উনি এসে হাজির হবেন আমি জানতাম।

গল্পটার নাম পাল্‌টালাম আবার। বারবার তিনবার। এবার-কার নামকরণ হোল মহীশমর্দন। ডিটেক্‌টিভ গল্পটা আরেক ধাপ এগুলো। তৃতীয় ধাপ। নাম্‌তার ধাপ্পা। বস্তুতঃ তরোয়ালের চেয়ে বেশি ক্ষমতা ধরলেও, কলম তার মতই অনেকটা। উভয়েই কাটতে কাটতে এগোয়। আর লেখাও, যতই কাটা পড়ে, ততই আরো অকাট্য হয়ে ওঠে।

মহীশবাবুর চরম কথাগুলি কানে বাজছিলো আমার—'গল্পের মধ্যে কোনো খাদ থাকলে চলবে না মশাই! গল্পও যে শোনার জিনিস। সোনার জিনিস যদি খাঁটি না হয় তাহলেই মাটি। তাহলে তার আর দাম কী বলুন?…'

এবং ঐখানেই শেষ নয়। তার পরেও আরো—'আপনার গল্পটায় অপরাধের মধ্যেই শুধু ফাঁকি নেই, অপরাধীর ভেতরেও ফাঁক। সত্যি বলতে, সেইখানেই এর গল্‌তি। আপনার এই গল্পটাই আসলে অপরাধী। এমন 'গিল্‌টি' লেখা আপনি চালাতে এসেচেন আমার কাছে? আমার মতন জহুরির কাছে? ছিঃ!…' বলে তিনি আমাকে বারম্বার ধিক্কার দিয়েছিলেন।

সেই থেকে গিল্‌টি-কন্‌সেন্স্‌টা আমার মনে জেগে রয়েছে। ছি ছি করেছে ক্ষণে ক্ষণে। আর, খাদের আইডিয়াটাও—বলতে কি—পেলাম আমি তার থেকেই।

আমাদের এ-বাড়ির কাছেই সেই অতলস্পর্শী গহ্বরটা। এমন খাদ যে তার মধ্যে যদি কেউ পড়ে, তার আর বাদ দেবার কিছু থাকবে না। পড়তে না পড়তেই, তুলো হয়ে—ধুনে—

পিঁজে—সুতো হয়ে—বুনে—খাদি হয়ে বেরুবে। অন্য ধার থেকে।

নাঃ, বেরুবার কোনো কথা নেই। সূত্রপাত অব্দি আছে, তারপরে আর নেই। শেষ কোথায় এই খাদের এবং এর খাদ্যের—কেউ তা বলতে পারে না।

খাদটাকে গিয়ে পরীক্ষা করলাম আবার। স্বয়ং খাদক হয়ে নয়—বলাই বাহুল্য! কোনো জিনিস তলিয়ে দেখার ভাগ্য আমার হয় না। আমার হচ্ছে ওপর-ওপর। সোনার বেলায়, সোনালীদের বেলায় যা দেখেছি, যেমনটা দেখা গেছে, যেমন-ধারা ঘটেছে আমার এ-জীবনে—খাদের বেলাই কি তার অন্যথা হবে?

আমাদের বাংলোর থেকে দু ফার্লং দূরে খাদটা। গত আসামী ভূমিকম্পের সময়েই পাহাড়ের এধারটা ধ্বসে গেছল। কিনারার কাছটা কাচের মতই ক্ষণভঙ্গুর হয়ে রয়েছে। তারপর থেকেই প্রায় পড়ো পড়ো অবস্থায়—দয়া করে পড়লেই হয়।

অদূরের একটা গাছে দড়া বেঁধে কোমরের সঙ্গে জড়ালাম। তারপর আল্‌গা পায়ে গেলাম কিনারার কিনারে। কাছাকাছি একটা ফাটলের ফাঁকে একখানা দশটাকার নোট গুঁজে রেখে চলে এলাম।

তারপর পকেট বই বের করে খুনীর মনস্তত্ব নোট করতে লাগা গেল। শিকারকে বাগাবার আগে খুনীর মনের বিকার কেমন হয়—তার মনে কেমন চোট লাগে! প্রথমেই মনে হোলো—খুনটা যেন বেমালুম ঘটে। কেউ না টের পায় যেন··· এমন ভাবে যেন চুকে যায় যাতে···খুনেই ব্যাপারটার চরম হয়ে খতম্‌ হয়ে যায়। কোনোই খুৎ থাকে না। তারপরে

আর খুঁৎখুঁতি জাগে না কারো। খুন করার পর হাতকড়ায়—হাতকড়ার থেকে কাঠগড়ায় গিয়ে না গড়ায়। আসামী হয়ে না দাঁড়াতে হয় অবশেষে। সব ফাঁস হয়ে গিয়ে—ফাঁসি না হয়ে যায় শেষটায়।

অবশ্যি, ফাঁসিকাঠে যে ঝোলে, যাকে ঝুলতে হয়, তারও একটা মনস্তত্ত্ব আছে—এবং সেটাও কিছু কম মারাত্মক না। সেটাও জানবার, কিন্তু অদ্দুর এগুবার আমার বাসনা হয় না, সেরকম অবস্থায় পড়লে মন যে কেমন করে তা আমি জানি কিন্তু ঠিক কেমন-কেমনটি করে তা জানতে সেই ঝুলনযাত্রায় গলা বাড়াবার মত বৈজ্ঞানিক মানসিকতা আমার নেই। ফাঁসিতে গিয়ে লট্‌কানোর চেয়ে, আমার মতে, খুন করে সট্‌কানো ঢের ভালো।

দিনদুয়েক পরে মহীশবাবু দেখা দিলেন। দেখলাম তেম্‌নি হৃষ্টপুষ্টই রয়েছেন। শুকিয়ে যাননি একটুও। দেখে খুশিই হলাম। অবশ্যি, খাদের ধারটা কাঁচের মতই ভঙ্গুর, তা ঠিক, কিন্তু কাঁচও তো অনেক সময়ে কাঁচা কাজ করে। ভাঙে না। কিন্তু মহীশবাবুর দিকে তাকালে এমন পাকা গুটি কাঁচাতে পারবে বলে মনে হয় না। এই পাহাড়ে দেহ যদি ওই ভঙ্গুরতার ওপরে গিয়ে পড়ে, সে-দৃশ্য কল্পনা-নেত্রে দেখবার। মোষের মতন মহীশের আড়াইমনী ভার পড়লে আর দেখতে হবে না। কনে দেখার মতই পাকা কাজ হবে। পাহাড়ের কোনো কোণেই ওঁকে আর দেখা যাবে না।

এসেই ওঁর প্রথম কথা—হাঁস কই ? গোড়াতেই হাঁসফাস !

আমি হাসলাম—'এই তো আসছেন, খেয়ে দেয়ে একটু আরাম করুন—জিরিয়ে নিন্‌। রোদ পড়লে বেরুনো যাবে।

বাংলোর ওধারে—জংলী ধারটায়—পাহাড়ের কিনারে বিকেলে কতো হাঁস যে এসে পড়ে তার ইয়ত্তা হয় না।'

'তাই নাকি? বটে বটে?' উৎসাহে উনি পাতিহাঁসের মতই ককিয়ে ওঠেন।

'হাঁস ধরার কাজ--সে-কাজ আজ বিকেলেই হাসিল করা যাবে।' বলে আমি আরেকটুখানি হাসি।

তারপর আমার নোটবই বার করে নিজের মনের খবর টুকতে বসি। সত্যি বলতে, আমার—মানে, আমার অন্তরগত খুনেটার—একটু যেন মন কেমন করে। মহাশের ওপর একটু মায়াই হয়। আমার গল্প কাটলেও—এমন কি, আমাকে অমন কটু-কাটব্য করলেও ওর আসন্ন বিয়োগ আমাকে একটু বিধুর করে তোলে। খাদের তলায় ও কাত হয়ে পপাত, মনশ্চক্ষে সে-দৃশ্য দেখে আমি কাতর হই।

কিন্তু আর্ট্ কর আর্ট্স্ সেক্। আর্টের জন্যে যেকোনো ত্যাগ-স্বীকারে পেছপা হলে চলে না। আর্টের খাতিরেই আমাকে হার্টলেস্ হতে হবে, ওকে হার্টফেল্ করতে হবে। বাধ্য হয়েই মহাশকে ত্যাগ করতে হবে আমায়। ওর মায়া কাটাতে হবে—নিদারুণ নির্ব্যক্তিকভাবে অমায়িক হতে হবে আমাকে।

বিকেলে আমরা বেরুলাম। ঝকঝকে রোদের ধপ্ধপে দিন। খাদের অভিমুখে রওনা হওয়া গেল। যেতে যেতে বললাম—'আরেকটু বেলা পড়লেই হাঁসরা আসবে। এসে পড়বে অকুস্থলে। তবে তার একটু আগেই বেরুনো যাক্।'

কিনারাটার কাছাকাছি নোটখানাকে দেখা গেল। ফোকরে আটকানো রয়েছে সেইরকম। ভালোয় ভালোয় রয়েছে। জ্বল্ জ্বল্ করছে উজ্জ্বল আলোয়।

মহীশবাবুর দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করি—'দেখুন তো, একখানা দশ-টাকার নোট না? নোট বলেই যেন মনে হচ্ছে। ঐখেনে, ঐ ঘাসের ওপরটায়?'

তিনি দেখলেন—'হ্যাঁ, সেইরকমই তো দেখাচ্ছে বটে। কাছে গিয়ে দেখতে হয়।' এই বলে তিনি এগুলেন।

সম্পাদকদের দূরদৃষ্টি—লেখকদের দুরদৃষ্টের মতই—সমান প্রখর। তবে টাকা আদায় করবার শক্তি দুজনের সমান নয়। স্বভাবতই সম্পাদকের তা একটু বেশি, এবং সম্পাদকেরা সে-বিষয়ে বেশ হিসেবী।

সেদিকে লেখকেরা বরং একটু বেহিসেবীই। এই, এখনই দেখুন না, চোখের ওপরেই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। মহীশকে আগুয়ান হতে দেখেই আমার মনে হোলো—আর, মনে হয়ে মন খারাপ হয়ে গেল—নোটখানা দশটাকার না হলেও

হোতো। কোনো ক্ষতি ছিল না। পাঁচ টাকার হলেও চলতো। এমন কি, একখানা টাকার নোটেও চলে যেতে পারতো—অনায়াসেই। আমরা লেখকরা আর্টের স্বার্থে এম্‌নি মুক্তহস্ত! অর্থব্যয়ে কোনোই পরোয়া করিনে, বাড়তি খরচা করতেও কুণ্ঠিত নই, কিন্তু তাই বলে অপব্যয়ের কোনো মানে হয় না।

যাকগে।...মহীশ তো গেল। সঙ্গে সঙ্গেই গেল। নোটখানার সঙ্গেই। নোটের ওপর তার মোট গিয়ে পড়তে না পড়তেই পাহাড়ের ধারটা ধ্বসে পড়লো। বিচ্ছিরি চীৎকারের রেশ বাতাসে মিলিয়ে যেতেও বেশিক্ষণ লাগলো না।

ফিরে এসেই লিখতে বসলাম গল্পটা—ঘটনাটা টাট্‌কা থাকতেই। মনস্তত্ত্বমূলক লেখার মূল কথা, মনের তত্ত্ব তাজা থাকতে থাকতেই লিখতে হয়—কাগজের পিঠে তুলতে হয় আমূল। ঠিক মূল্যের বেলায় যেমন। হাতে হাতে নগদ নগদ। কিম্বা, মূলোর বেলাও বলতে পারেন! সেরকম লেখা কখনই অমূলক বলে বোধ হয় না। মূলো খেলে যা হয়, যেমনটি হয়, সে-লেখা পড়ে পাঠকেরো তাই ঘটে। তার মনে ঢেঁকুর উঠতে থাকে—অনেকক্ষণ ধরে। সমস্ত মনকে গন্ধমাদন করে তোলে। উটমুখো সম্পাদকেরা সেসব লেখারই মূল্য দেন। স্বর্ণমূল্য।

সে-লেখা সোনার মতই। নিতান্তই খাঁটি—তার মধ্যে কোনো খাদ নেই। এবং শোনানোর মতও। কিন্তু শোনাই কাকে মশাই? ধারে কাছে কোনোই সম্পাদক নেই। একজন যিনি ছিলেন তিনি নিজেই এখন জানাশোনার বাইরে। ধর্মতত্ত্বের ন্যায় গভীর গুহার গর্ভে নিহিত। শোনায় খারাপ, কিন্তু তাহলেও, তিনি নিজেই এখন খাদের মধ্যে গণ্য।

[ছয়]

দীর্ঘ উটি আছে ঝুলে

মেয়েদের একটু স্বাদ পায়, নিখিলের অনেকদিনের সাধ। মেয়েদের নিয়ে একটু ফূর্তি করে। ফুর্তি মানে এমন কিছু না, এই, সঙ্গে নিয়ে বেড়ানো, সিনেমায় যাওয়া, রেস্তোরাঁয় খাওয়া —এই সব। ফুরফুর করে ঘুরে বেড়ানো উড়ে বেড়ানো— প্রজাপতির মতই। নিছক্ প্রজাপতিগিরি—যা পতিগিরিতে গড়িয়ে প্রজাসৃষ্টিতে মজাবে না। পতিত্বের দায় নেই, পাতিত্যের বালাই নেই—এমন সব মেয়েদের সঙ্গে এম্নি একটু আমোদ।

কিন্তু মেলে কোথায়? নিখিল-জগতে এত মেয়ে, কিন্তু নিখিলের জগতে একটিও নাস্তি। টাকা ওড়াতে তার বাধা নেই—পৈতৃক বিত্ত যে-ব্যাঙ্কে মজুদ্ তা এখনো পদ্মার পাড়ের মত ফেল মারেনি—জলাঞ্জলি যায়নি এখনো। নিজেকে ঘোরাতেও সে রাজি—চর্কির মতই অবাধে—কিন্তু ঘুরছে কে? অথচ, পথে ঘাটে চারধারেই, এত মেয়ে একলা একলাই ঘুরে মরছে—তার সঙ্গে ঘুরতে (ওরফে, তাকে ঘোরাতে) ওদের একটাও যদি রাজি হয়। তেমন বেয়ে চেয়ে দেখলে একটাকেও কি রাজি করানো যায় না?

মনে সাধ থাকলেও, কাছে গিয়ে সাধবার সাধ্য নেই নিখিলের। চোখের সামনে ফুটফুট করলেও, মনের মধ্যে ছুঁচের মত ফুটলেও—পাছে কাঁটা মারে সেই ভয়ে ফুটন্ত কারু

কাছে এগুবার তার সাহস হয় না। ফুটফুটেদের আশে-পাশে থেকেও মুখ ফুটে না বেচারার।

অথচ, আর সব ছেলেরা—! তার বন্ধুরাই তো! কেমন স্মার্ট, কদ্দূর চৌকস, কিরকম বাহাদুর! যদ্দুর দুঃসাহসী আর রোমান্টিক হতে হয়। তাদের লীলাখেলা কী রোমাঞ্চকর! কেমন করে গায় পড়ে মেয়েদের সাথে ভাব জমায়, জমে জমে জমাট হয় ক্রমে—সখ্য-সুখের সখ মিটিয়ে নেয় কেমন! মেয়েদের এখানে সেখানে নিয়ে যায়—লেকে, বোটানিক্সে,—সিনেমায় তো বটেই—ভাবলে অবাক্ হতে হয়।

অচেনা মেয়েকেও চোখের পলকে চিনে নিতে—চেনের মধ্যে টেনে—বেঁধে ফেলতে তাদের জুড়ি নেই। এমন ওস্তাদ্ আর হয় না।

অবশ্যি, কারো ওস্তাদি সে নিজের চোখে এখনো ছাখেনি, তা ঠিক। তাদের মুখেই শোনা—কিন্তু তাহলেও অবিশ্বাসের কী আছে? প্রেমের ফাঁদ ভুবনময় পাতা, কে কোথায় কাকে পাত করবে, নিজে চিৎপাত হবে, সেই পরম দুর্ঘটনার মুহূর্তে কি তারা ডেকে আনতে যাবে নিখিলকে? সাধ করে তাকে এনে দেখবার জন্যেই? রবিবাবুর সেই গানের মতই—'দুজনে যেথায় মিলেছে সেথায় তুমি থাকো প্রভু, তুমি থাকো!'

না, তা হয় না। গোপালরা প্রেমে পড়ে, (এবং পাড়ে,) কিন্তু ত্রুটি একটু থাকেই! চুটিয়ে প্রেম করলেও কখনো সাক্ষি রেখে করে না। সুবোধ বালকের মতই তারা যাহা পায় তাহা খায়, এবং পরে ফলাও করে সেই ফলারের কাহিনী শোনায়। কিন্তু কাউকে দেখিয়ে তারা খায় না। এসব ব্যাপারে সাক্ষি-গোপাল চায় না তারা। যে-জিনিস দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখে খাওয়া যায়, তা তৃতীয় ব্যক্তির সম্মুখে খাওয়া যায় না।

দেখলেই চেনা যায় এসব ছেলেদের—চিনতে কারো দেরি লাগে না! চোখে মুখে কথা, চলনে বলনে তুবড়ি, সাজসজ্জায় আপ টুডেট্—সব বিষয়েই তুখোর। কায়দাদুরস্ত। যেমনটি হতে হয়। দেখলেই বোঝা যায় অবলা নারীজাতির পক্ষে এরা এক একটি মহামারী। ধরলে আর রক্ষে নেই।

এই যেমন, দিব্যেন্দু! ওকেই ধরা যাক্ না! এতক্ষণ ধরে সামনে বসে সিগ্রেটের এত যে ধোঁয়া ছাড়লো, তেম্‌নি কি আলোও ছড়ায়নি খানিক? কি করে অন্ধকারময় নিঃসঙ্গ অবকাশকে আলোকিত করা যায় তার রহস্যও কি সে বাতলায়নি? নিরন্ধ্র নিশ্চন্দ্র জীবনে চাঁদের হাঁসির বাঁধ ভাঙতে হলে বাধা কোথায়, আর চাঁদাই বা কতো, তাও কি খুলে বলেনি সে? আইটেম্ বাই আইটেম্?

'টাকা খরচায় কি আমি পেছপা দিবু?' জবাব দিয়েছে নিখিল—'কিন্তু তুমি তো জানো, কিছুতেই আমি জমাতে পারিনে। মেয়েদের পেছনে খরচা করতে আমি রাজি, কিন্তু তাদের সঙ্গে ভাব জমাতে হলেই আমার হয়েছে!'

'মেয়েদের সাথে ভাব জমাতে কতোক্ষণ? জমাটি ভাব হতে কতোক্ষণ লাগে? কিন্তু মেয়েদের যদি তুমি যমের মত মনে করো তাহলেই তো সব মাটি।'

বলেছে দিব্যেন্দু। বলেই কালকের জমানোর যতো কথা—এতক্ষণ ধরে জমিয়ে রাখা—উজাড় করেছে তার কাছে। ইস্, কা ফুর্তিটাই না গেছে কাল! কী ফুর্তিবাজ মেয়েরে ভাই! আর দেখতেও কী অপরূপ! আলাপ হয়ে গেল হঠাৎ! দু' মিনিটেই। তারপর তৃতীয় মিনিটেই তারা সটান্ চলে গেছে সিনেমায়। সেখান থেকে রেস্তরাঁ। চৌরঙ্গীতে তো রেস্তরাঁর অভাব নেই। আর বয়রা সব এম্‌নি সমঝদার! টিপে দিলেই

হোলো। অমনি সঙ্গিনীর অরেঞ্জেডের সঙ্গে ভারমুথ মিশিয়ে দেবে—TIP দিলেই তারা বোঝে। এই করে করেই পরিপক্ক তো? পরিদের নিয়ে আর পরদের নিয়ে কারবার করেই পাকা—বয়রূপী সেই বয়স্থরা! তারপর? খাওয়া দাওয়া সেরে ট্যাক্সি করে তারা বেড়িয়েছে খানিক। রেডরোডের এদিক
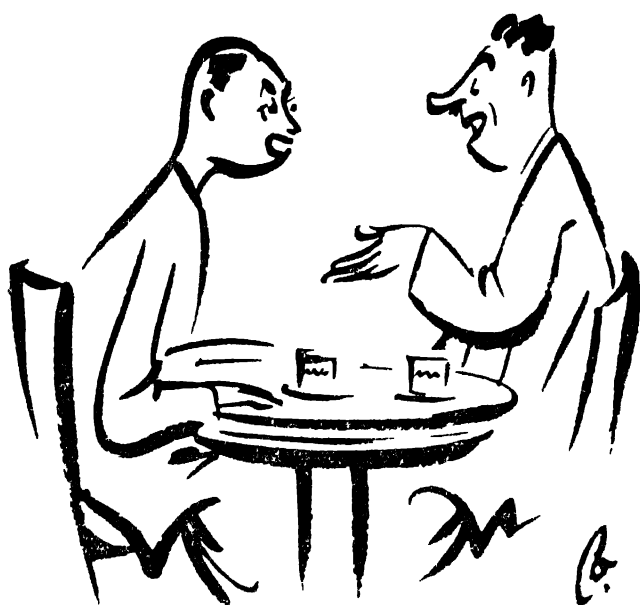
ওদিক। তারপর? তারপরে মেয়েটিকে তার বাড়ির কাছাকাছি নামিয়ে দিয়ে সে বিদায় নিয়েছে...অবশ্যি, কিছু-না-কিছু আদায় করেই! আদায় কাঁচকলা আর যে-ফলারেই চলুক, ভালোবাসার ভোজে অচল। অন্ততঃ, মুখোমুখিও কিঞ্চিৎ নইলে সবটাই যে ভোজবাজি দাঁড়ায়!

'এমনধারা যে হতে পারে, তা তো ভাই, আমি

ভাবতেই পারিনে।' দীর্ঘনিশ্বাস পেড়েছে নিখিলেশ : 'আমার ধারণাতেই আসেনা এসব। এরা কারা ? এসব মেয়েরা থাকে কোথায় ?'

কোথায় আবার! এই কল্‌কাতাতেই। দিব্যি গেলেছে দিব্যেন্দু। সিনেমাষ্টার সব! তা ছাড়া কী ?

'সিনেমাষ্টার ? কী সর্বনাশ !' আঁৎকে উঠেছে নিখিল। তারা কি কখনো ধরা দেয় ? তাদের কি কেউ ধরতে পারে ? তারা তো সুদূর আকাশের ! কক্ষচ্যুত হয়ে কখনো ধারে কাছে পড়লে...তাদের ছোঁয়াচে এলে কি বাঁচে কেউ ?' সিনেমাষ্টার —এত বড়ো ডিজাষ্টারের কথা সে ভাবতেই পারে না।

'এখনো ষ্টার হয়নি তো। হবার পথেই। এখন তারা একস্‌ট্রা। ছোট খাটো পার্টেই নামে এখনো। এরাই কালেক্কে ষ্টার হবে একদিন—যখন কল্‌কে পাবে।' দিব্যেন্দু বলতে চায়।

এই সব একস্‌ট্রা –এখন যারা একেবারেই অর্ডিনারী, এই নারীরাই একদা কোনো রহস্যময় যোগাযোগে, একস্‌ট্রা-অর্ডিনারী হয়ে উঠবে। এই বনবিড়ালই বনে গিয়ে, পরিচালক প্রযোজকদের সঙ্গে বনিয়ে—বনবিড়াল হয়। তখন—নখদন্ত বেরুবার পর—আর কি কেউ তাদের কাছে ঘেঁষতে পারে ? পাত্তা পায় তাদের ?

'আমারো ইচ্ছে করে এম্‌নি একটা হবুষ্টারের সঙ্গে ভাব জমাই, কিন্তু—' বলতে গিয়ে নিখিলের আটকায়। গলায় খিল্ লাগে। কুলুপ্ লেগে কুল্‌পিবরফের মতই জমে যায় ভাবটা।

'সে-ভার আমার। আমি জমিয়ে দেব তোর সঙ্গে, তাহলে তো হবে ?' দিব্যাঙ্গনা যোগাবার দায় দিব্যেন্দুর।

ঝক্কি ওর ঝুঁকি ওর—নিখিলের খালি একটু ঝোঁক দিলেই হয়।

তারপর? তারপর সেদিন বিকেলেই তারা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো টলিউডের দিকে। সন্ধ্যে হয় হয় এমন সময়

টালিগঞ্জের এক টেরে গিয়ে পাত্তা পেলো দুটি মেয়ের। বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলো তারা। ষ্টুডিয়োর ফের্‌তা—টের পেতে দেরি হয় না—গায়ে পড়ে বাড়ি পৌঁছে দেবার দায় নিয়ে দিব্যেন্দু তাদের গাড়িতে চাপিয়েছে।

এমন কিছু আহা মরি নয়, তাহলেও মেয়ে তো ! এবং ষ্টার হবার পথেই ! সব মেয়েই নিখিলের কাছে দুঃসাধ্য—আঁকের মতই কঠিন—নিতান্ত সাধারণ মেয়েও তেমন সহজ নয়। উদীয়মানা বা সমুদিতা তারকার কথা তো সে ভাবতেই পারে না। রীতিমতই তা উচ্চগণিত ; সোজাসুজি পাটিগণিতের মধ্যে যারা আসে তাদের মেলাতেই সে হিমৃশিম্ খায়। এবং এই একস্ট্রা—এ তো তার পক্ষে একশ গুণ শক্ত।

এমন একস্ট্রাও দিব্যেন্দু যে কতো সহজে কষলো ! বরফের মত মেয়েরাও এত সহজে গলে যায় দেখলে তাক্ লাগে। তাকাতে তাকাতে নিখিলরা গিয়ে পড়লো চৌরঙ্গিতে। সেখানে এক হোটেলে পরীদের নিয়ে পরিতোষপূর্ব্বক পানাহারের শেষে বাড়ী পোঁছোনোর পালা এলো। তখন জানা গেল তারা থাকে দমদমের কাছাকাছি। ট্যাক্সি-মিটারের দিকে তাকালে দমে যাবার কথাই, স্বভাবতই, কিন্তু নিখিলের এই প্রথম উদ্যম। জীবনের সঙ্গে এই তো সাক্ষাৎ-পরিচয় ! এর ট্যাক্সো মিটাতে সে পেছপাও হবে না।

নাথিং আন্‌ফেয়ার ইন্ লাভ অ্যাণ্ড ওয়ার। আর, ট্যাক্সির বেলাতেও সেই কথা। সবটাই তার ফেয়ার। বি টি রোড দিয়ে যেতে যেতেই সাতাশ টাকা উঠে গেল—পিটিয়ে উঠতে লাগলো ভাড়া। কিন্তু দিব্যেন্দুর কোনো তাড়া ছিল না। ট্যাক্সি-ওয়ালাকে যে টিপে দিয়েছিল—যেটা হোটেলের বেয়ারাকে করণীয় সেই বেয়াড়া কাজ ট্যাক্সি-চালকের উপর দিয়েই হোলো কিন্তু শিখ হলেও সে শিক্ষিত। বেশ চালাক্। এসব বিষয়ে অবুঝ নয় ! পাড়ির মাঝামাঝি এসে তার গাড়ি বিগড়ালো—আঁলো-আঁধারি এক জায়গায়। নিতান্ত প্রত্যাশিত গাছের

ডালের আব্‌ডালে ! তার ছায়ান্ধকার পরিবেশে—মাটি আকাশ সমস্ত মিলিয়ে সব জমাটি সেখানে।

ড্রাইভার উঠে মোটর সারতে লাগলো। হু হু করে মোটার উঠতে লাগলো এদিকে। ওদিকে দিব্যেন্দু লাগলো—। এবং নিখিলকেও লাগবার জন্য এক টিপুনী লাগালো।

কিন্তু লাগবে কি, নিখিলের সঙ্গিনী তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সারাদিনের খাটুনির পর ঘুমিয়ে পড়েছে ফাঁকা রাস্তার খোলা হাওয়ায়। আর এদিকে দিব্যেন্দুর সহচরী সহসা এক চড় কসিয়েছে দিব্যেন্দুকে। লাগসই হবার মুখেই অপ্রত্যাশিত এই

লাগানো! পরিচর্যার গোড়াতেই এই বিপর্যয়—পরির এই চড় যা

যা নিখিলের ধারণার অতীত! অবশ্যি, একস্ট্রা কষা শক্তই, সেকথা তার জানা ছিল। কিন্তু একস্‌ট্রারাও যে আবার কসায়, বেশ শক্ত রকমের, একথা তার জানা ছিল না।

চড়টা গাড়ীর ওপরে হলেও, ড্রাইভারের ওপর পড়েনি। তা না পড়লেও, গাড়িটা তারপরে সহজেই শুধরালো। বাকী রাস্তাটাও কেটে গেল—নির্বিবাদে। তাড়াতাড়িই। দমদমের এক বস্তিতে মেয়েদুটিকে নামিয়ে দিয়ে, ট্যাক্সী ছেড়ে, সর্বস্বান্ত অবস্থায়, রাত সাড়ে এগারোটার ফিরতি ট্রেনে থার্ডক্লাস কামরার ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে চিড়ে চ্যাপটা হয়ে তারা বাড়ি ফিরলো।

ক্ষুব্ধ অনুতপ্ত কণ্ঠে ক্ষমা চেয়েছিলো নিখিলেশ—'আমি ভাই ভারী অপয়া। আমার জন্যই এমনটা হোলো। আমি না থাকলে কখনোই এমনটা ঘটতো না! এ আমি হলপ্‌ করে বলতে পারি। দু' দুটোকে নিয়ে দিব্যি তুমি জমাতে পারতে—মজাতে পারতে একলাই! আমার জন্যই এমন মজাটা তোমার মাটি হোলো। কেবল আমি থাকার জন্যই···ফুর্তিটা ভেস্তে গেল তোমার। আমায় তুমি মাপ করো ভাই।'

'না না—কিছু না।' উড়িয়ে দিয়েছে দিব্যেন্দু নিজগুণেই—'ও তুমি কিছু মনে কোরো না। এমন হয়! মাঝেমাঝে ঘটে বই কি! কোনো কোনো মেয়ে এরকম চটে যায় প্রথমটায়। পরে আবার তারাই ফের ভীষণভাবে পটে! ওই মেয়েই এর পরের ক্ষেপে—দেখো না তুমি...'

কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখার সাহস হয় না নিখিলের। এর পরের ক্ষেপে—এই মেয়ে ক্ষেপলে আরো কতোখানি দারুণ হতে

পারে—সে ঘটনা পরখ করার মতো বুকের পাটা তার নেই। পরীদের নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার এইখানেই তার ইতি।

তারপরের বিকেলে নিজের হোটেলের রেস্তরাঁয় বসে সে চা খাচ্ছে এমন সময় পাশের খুপরিতে শুনতে পেলো, একজন বলছে আরেকজনকে—

'ইস্, কী ফুর্তিটাই না গিয়েছে ভাই কালকে! দু' দুটো সিনেমা স্টার—উদীয়মানাই এখন—নাম বলায় বারণ আছে ভাই, মাপ করো। ভদ্রঘরের মেয়ে, বুঝতেই পারছো।...যাক্ সেকথা, তারপর স্টুডিয়ো থেকে তাদের নিয়ে উঠলাম তো ট্যাক্সিতে। আমি আর আমার এক বন্ধু। দুজনায় দুজনকে বখ্‌রা করে নিলাম। সেখান থেকে গেলাম ফার্পোয়। তারপর রেড রোডে কয়েক চক্কর ঘুরবার পর...ট্যাক্সি দিলাম ছেড়ে। ময়দানে হাওয়া খেলাম খানিক। আমার বন্ধুটিও তো সেয়ানা। আমার মতই ওস্তাদ! সে তার সঙ্গিনীকে নিয়ে আস্তে আস্তে পিছিয়ে পড়লো...তারপর? তারপর যা হবার তাই...ইস্, সে যে কী ফুর্তি ভাই কী তার বলবো! .'

'কালিরজনীতে জ্যোৎস্না-নিশীথে কুঞ্জকাননে সুখে—ফেণিলোচ্ছল যৌবনসুরার' সুরঞ্জিত কাহিনী দিব্যেন্দু সুরেলা গলায় শোনাচ্ছে শ্রীমান্ প্রবীরকে। তাদেরই অপর বন্ধু—আরেক বীরকে। তার চোখের সামনে ছবির মতো ফুটিয়ে তুলছে—দৃশ্যের পর দৃশ্য। আর প্রবীর দেখছে—দিব্যচক্ষে। দিব্যি গেলে বলছে দিব্যেন্দু। দিব্যেন্দুর কথাগুলি দৈববাণীর মতই বাজছে নিখিলের কানে। শুনছে সে দিব্যকর্ণে।

শুনতে শুনতে ওর অসহ্য হয়। রাগ চড়ে ওর। ইচ্ছে

করে এক চড়ে ওকে গিয়ে থামায়—! দিব্যি গাল বার করে ওর। সেদিনের সেই পরকীয়া-চর্চার সুদহিসেবে—ওর রগের ওপর—এই রাগের ওপর একটুখানি পরচড়্‌চা করে দেয়।

রেগে মেগে সে বেরয়। রেস্তরায় লবি পেরুবার মুখে, ম্যানাজারের টেবিলের কাছে এসে পরমাশ্চর্য এক মেয়ের সামনে পড়ে যায়।

অমন মেয়ের দেখা শুধু স্বপ্নেই মিলে থাকে। কিম্বা সিনেমা পত্রিকার পাতায়। সৌন্দর্যের নিরিখ ধরে বিচার করলে—

কিন্তু নিখিল বিচার করে না, নিরীক্ষণ করে। তামাম্‌ দুনিয়ায় যেন তোলপাড় নিয়ে আসে সেই সোনালী মেয়েটি।

টেবিলে-রাখা সান্ধ্য সংস্করণ খবর কাগজটি হাতিয়ে তাকে

বসতে হয়। বসে পড়ে সে খুপসুরৎ মেয়েটির সম্মুখে। পাশের খুপরিতে চড়াও হয়ে দিব্যেন্দুকে শিক্ষা দেওয়ার কথা সে ভুলে যায়। অপরকে গিয়ে বসাবার আগে তাকেই যেন কে বসিয়ে দেয়!

খবরের অজুহাতে মেয়েটির দিকে সে তাকিয়ে থাকে···

তরুণী সুবেশিনী ও তন্বী। নিখিলের একদৃষ্টির বিনিময়ে একটু সে হাসলো—বেশ মিষ্টিহাসিই—এমনি ঠাওর হোলো নিখিলের। চোখের কোণে একটু যেন ঝিলিক্ খেলে গেল—চকিতের জন্যেই।

যে ব্যক্তি দু'বার কোনো মেয়ের দিকে তাকায় তার মতন বোকা দুনিয়ায় নেই। এ তথ্য নিখিলের অজানা নয়। শুধু যে দেখে শেখা তাই না, ঠেকে শেখাও বই কি! এ-জীবনের শিক্ষা না হলেও, পরজীবনের তো বটে। অপরদের জীবদ্দশায় বারম্বার ঠকে ঠকে শেখা। এই তো দিব্যেন্দুর সঙ্গেই···কিন্তু তবুও নিখিলের শিক্ষা হয় না। জ্ঞানলাভের এই অক্ষমতা তার অতুলনীয়। নির্ণিমেষ নিখিল তবুও দেখে—নিজের দুর্বলতা আর অদুরবর্তিনীকে সমদৃষ্টিতে না দেখে সে পারে না।

'কী চাই আপনার বলুন।' জিজ্ঞেস করেন ম্যানেজার।

'একখানা ঘর চাই, শুধু আজকের রাতটার জন্যেই।' জানায় মেয়েটি: 'ঢাকা থেকে আমি আসছি। কাল হাজারিবাগ যাবো।'

'ভারী দুঃখের কথা, কিন্তু কী বলবো, আমাদের একটা ঘরও খালি নেই আর।' বিষণ্ণ হাসি হাসলো ম্যানেজার।

'তাহলে—তাহলে কী হবে?' মেয়েটি মুষড়ে পড়ে: 'কল্‌কাতায় আমাদের জানাশোনা আত্মীয়বন্ধু কেউ তো নেই। কোথায় যাই তাহলে?'

'কিন্তু কী করবো বলুন। কোথাও একটু ফাঁক নেই যে হোটেলে। বড়দিনের মরশুমে ভর্তি সব।'

ম্যানেজারের দুঃখের সঙ্গে সায় দেয় নিখিল—নিজের মনেই। এমন কি, তার নিজের ঘরটাও তো ভরাট—একমাত্র তার ভর্তিত্বের দ্বারাই ভরপুর।

'কিন্তু—কিন্তু দেখুন, আমি তো ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকতে পারিনে? রাত কাটাতে পারিনে কোনো পার্কে? ওয়েটিংরুমে বসে থাকতে পারিনে সারারাত?'

কথাটা যুক্তিসহ। কিন্তু হোটেলের ম্যানেজারটা যেন কী! এহেন বিহিত কথাতেও একটুও বিগলিত হয় না।

"খুব—খুবই দুঃখের বিষয়, কিন্তু—কিন্তু একটু-একটুও খালি নেই যে।' বলতে গিয়ে—বলতে কি—তিনি একটু কিন্তু কিন্তুই হন।

দ্বিত্ব-প্রয়োগের দ্বারা বিশদ করে, আরো জোরালো করেই জানাতে চান বোধহয়।

নিখিল আর স্থির থাকতে পারে না। নিজের কথা পাড়ে।

'দেখুন, এ-অঞ্চলে আরো তো ঢের হোটেল আছে, সেগুলি কি আপনি দেখেছেন?' জিগেস করে মেয়েটিকে।

'এই বড়দিনে কি সে সব জায়গাতেও এই অবস্থাই নয়?' মেয়েটি দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালে—'তাছাড়া এই ট্রেণজার্ণি করে এসে —এমন ক্লান্তিবোধ হচ্ছে যে—'

'ক্লান্তি বোধ করছেন? আসুন তাহলে ঐ টেবিলটায়—' মেয়েটিকে অভ্যর্থনা করে সে নিয়ে যায়।

'একটু চা খেলেই আপনার ক্লান্তি যাবে।' হোটেলের ছোকরাকে দু'কাপ চায়ের হুকুম দেয় নিখিল। এমন পরিবেশে চায়ের পরিবেশন হলে তার মতন মিষ্টি আর কিছুই হয় না।

'কী মুস্কিলেই যে পড়লাম'—চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মেয়েটি বলতে যায়, কিন্তু না বলেই শেস করে।

নিখিলও মুস্কিলে পড়ে। মেয়েটির সামনে বসে সে বুঝতে পারে, তার হাতের কাগজে সার্বজনীন যে সব মুস্কিলের বার্তা লেখা আছে এই মেয়েটির মুখোমুখি সেসব কিছু না। এহেন কুবার্তার কাছে সেগুলি বার্তাকু। সেদিনের বিমান-দুর্ঘটনাও কিছু নয়। এমন কি, এমন কোরিয়াও যেন গায় লাগে না।

'কাছাকাছি আর কোনো হোটেলে হয়তো—' নিখিলও শেষ করতে পারে না কথাটা। কেননা ভেবে দেখলে, আর কোনো হোটেলে যদিই বা হয় সেটা কাছাকাছি হয় না। নিখিলের কাছছাড়াই হতে হয়।

'আপনাদের এই হোটেলেরই নামডাক বেশি। শুনে-ছিলাম ষ্টেশনের তল্লাটে এইটেই নাকি সবচেয়ে বড়ো। এতেই যখন ঠাঁই মিললো না তখন আর—' তখন আর মেয়েটি কী বলতে ভেবে পায় না।

'তাহলে—তাহলে আর কী করবেন, এখানেই থাকুন।'

কথাটা নিখিল না ভেবেই পায়। আর অভাবিত ভাবেই বলে ফ্যালে। বরং বলবার পরেই সে একটু ভাবিত হয়। ভাবালু হয়ে বলে—'কিন্তু থাকতে হলে তো…' বলে সে থামে। তার বেশি আর সে বলতে পারে না।

'কোথায় থাকি ! ম্যানেজার তো বলছেন জায়গা নেই।'

'নেই, আবার আছেও। আছে জায়গা—আমার ঘরেই আছে।' নিখিল নিজের ঘরের খিল খোলে: 'আমার ঘরটাই তো আছে।'

'দেবেন ? দেবেন আপনার ঘরটা আমায় ?' ক্লান্ত দেহ

নিয়েই যেন লাফিয়ে ওঠে মেয়েটিঃ 'আহা—তাহলে-তাহলে তো বাঁচালেন আপনি আমায়।'

'যখন আর কোনো উপায় নেই, তখন মেয়েছেলে একলা কোথা যাবেন ? আজ রাতটা আপনি আমার ঘরেই থাকুন !'

'আর আপনি ?'

'আমি বারান্দায় কাটাবো নাহয়। একটা রাত তো।' সে বলে—'ডেক চেয়ারটা আছে, কম্বলও আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক কিছু আছে সেই বারান্দায়—নিখিলের মনে পড়ে। নোংরা বারান্দার কালি-ঝুল-আবর্জনা আর আরসোলাদের ভোলা যায় না। কিন্তু তাহলেও তার আশা, সে যেমন বীরের মতন ত্যাগস্বীকার করেছে, মেয়েটিও কি তেম্নি বীরাঙ্গনা হতে পারে না ? শীতের রাত্রে তাকে কম্বলের মোড়কে বারান্দায় পড়ে থাকতে না দিয়ে তার এই জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে না মেয়েটি ? ঘরের এক কোণে স্থান দিতে পারে না তাকে ? এমন কি, মনের এক কোনাতেও ? নিখিল বুঝি স্বপ্ন ছাখে। জেগে জেগেই স্বপ্নালু হয় বোধহয়।

'আপনি—আপনি চমৎকার লোক !' মেয়েটি নিখিলের

হাত জড়িয়ে ধন্যবাদ জানায়।—'এর—এর বিনিময়ে আপনাকে আমি কী যে দেব!'

'বলবেন না ওকথা। পরের জন্য কী করতে পারি আমরা? কতটুকুই বা পারি?' বাধা দিয়ে বলে নিখিল: 'করবার কটা সুযোগই বা আসে জীবনে! আমাদের লক্ষ্মীছাড়া এই নশ্বর জীবনে।'

কথাটা বলেই নিখিল তলিয়ে ছাখে! সত্যি বলতে, পরের জন্যে কিছু করতে হলে তার মতন দুর্যোগ আর হয় না। তবে হ্যাঁ, পরের সঙ্গে কোনোই তুলনা হয় না পরীর। পরের জন্য যাদের প্রাণ কাঁদে না, তারাও পরীর দুঃখে গলে যায়। বিগলিত হয়ে গড়িয়ে যায় তড়িদ্বেগে, এমন কি, গোল্লার পথেও—পরিণামের কথা একটুও না ভেবেই।

কেন এমনটা হয়? এরকমটাই হয়ে থাকে? নিখিল জিজ্ঞেস করে নিজেকেই। পরের বিষয়ে পশ্চাৎপদ থাকা গেলেও পরীদের ব্যাপারে কেন যে তৎপর না হয়ে পারা যায় না? কোন্ পরম কারণ এর মূলাধারে কে জানে! পর যেখানে পরাৎপরের মতই, সামনে থেকেও নজরে পড়ে না, পরীদের সেখানে অপরিচয়েও আপনার বলে ঠ্যাকে। আত্মীয়ের চেয়েও পরিজন বলে বোধ হয়। পরকে যেখানে মনে হয় কা আপদ, পরী সেখানে সংস্কৃত ক্রিয়াপদের মতই যেন! পাণি(ণি) গ্রহণ না করেও—সহজেই বুঝি তাকে পরস্মৈপদী থেকে আত্মনেপদীতে আনা যায়।

অবশ্যি, এখন পর্যন্ত নিখিল নিজে কাউকে এভাবে আনতে পারেনি, তা ঠিক, তবে বন্ধুদের এবম্বিধ আমদানির কথা তার জানা আছে। দিব্যেন্দুই তো কতো দিব্যকাহিনী শুনিয়েছে তাকে। কতো বন্ধুর জীবনেই তো কতোবার এমন হোলো!

তারপরে ফের, আমদানির পর ভালো করে রপ্ত না হতেই, রপ্তানির জন্যে ব্যতিব্যস্ত হতে হয়েছে আবার! দুর্বল মুহূর্তে পরীর কাছে নত হতে গিয়ে তার পরিণতি এমন দাঁড়িয়েছে যে—! কিন্তু এমনই তো হয়। পরীকে ত্রাণ করতে এগিয়ে শেষে পরিত্রাহি ডাক ছাড়লেও পরীর থেকে ত্রাণ পাওয়া যায় না। পার পাওয়া যায় না পরীর কাছে। কিন্তু না পেলেই বা কী? রাণীর দিকে খালি নজর দিলেই তো হয় না, নজরানাও দিতে লাগে।

তাহলে কি তার জীবনেও এলো নব-পরিচয়ের লগ্ন? এই ছন্নছাড়া জীবনে এলো রমণীয় লগ্নতা—অন্ধ গন্ধর্ব-পরিণয়? অপরের জীবনের দুর্যোগে এত অভিজ্ঞতা লাভের পরেও অপরিপক্ক নিখিল কি আজ একটু…? একটু বেহিসেবীই হবে?

কিন্তু অভিজ্ঞতার পরিপুষ্টিতে কী হয়! পরীর চড় যাই হোক (সে তো পরম্পরায় আসবার) তাবলে পরিচর্যার এমন সুযোগ কি ছাড়তে আছে?

একটু আগেই হাই তুলছিলো মেয়েটা। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিলো তার, স্মরণে আছে নিখিলের। সে দাঁড়িয়ে উঠে বলে—'আপনার ঘুম পাচ্ছে। চলুন, আমার ঘরটা আপনাকে দেখিয়ে দিই। খাবার নিয়ে আসতেও বলি। ট্রেনজার্নি করেছেন—ক্লান্ত আপনি! দুটি কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়ুন তাড়াতাড়ি।…'

তারপর কী যেন তার মনে পড়ে—'আপনার জিনিসপত্তর?'

'দাঁড়ান্ একটু।' বলে মেয়েটি উঠে বেরিয়ে যায়। বাইরে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই ফিরে আসে। হোটেলের বহির্দেশ থেকে নিয়ে আসে অপেক্ষমান এক যুবককে—প্রকাণ্ড সুটকেস সমেত।

'তুমি বাপু কোনো কাজের না! সারা তল্লাট ঘুরেও একটা জায়গা জোটাতে পারলে না। অথচ আমি এখানে এসে একটু না চেষ্টা করতেই কেমন দিব্যি একটা ঘর পেয়েছি। আজকের রাতটা তো থাকা যায়ই, ইচ্ছে করলে এই বড়দিনটাও

এখানে কাটিয়ে ক্রিকেট খেলাটা দেখে যাওয়া যায়। মাস-খানেক পরে মাসীর বাড়ী গেলে ক্ষতি কী? লোকটি এমন ভদ্রলোক, এতই ভালো যে একটুও আপত্তি করবে বলে মনে হয় না...' বলতে বলতে সে হোটেলের মধ্যে পা দেয়—'এই যে, ইনিই সেই ভদ্রলোক—যাঁর কথা তোমায় বলছিলুম...'

ঘরোয়া বেপরোয়া নিখিলের সঙ্গে সুটকেস্‌খানের পরিচয়-

করিয়ে দেয় মেয়েটি ঃ 'আর ইনি হচ্ছেন আমার—আমার কাজিন্ মহীতোষ—ঢাকার থেকে আসচেন আমার সঙ্গে।'

নিখিল প্রতিনমস্কার করতে ভুলে যায়। কন্‌কনে বারান্দার কোণ বুঝি তাকে উন্মন করে। পরকে ঘর দিয়ে (পরী তার সঙ্গে জড়িত) পোড়ো বারান্দায় ঝুলে থাকতে—ঝুলের মধ্যে পড়ে থাকতে হবে। দীর্ঘ শীতের রাত্রি—এবং এই একটা রাতই হয়ত না, সারা বড়দিনব্যাপীই এই উইকেট্-কীপিং—ক্রিকেট খেলার এই হিড়িক—এহেন আমোদের মরশুম চলবে মনে হয়।

পরিস্থিতি বুঝি একেই বলে? একেই বলে বোধহয় প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ!

[সাত]

ঋষি মশাই বসেন পূজায়

বাংলাদেশ থেকে দশশালা বন্দোবস্ত তুলে দেবার তোড়জোড় চলছে, সেদিনের কাগজের খবরটা সমরের কাছে পেশ করলাম।

সমরের কোনো ইতরবিশেষ দেখা গেল না। সে বললে, 'বাংলা থেকে? বিহার থেকে না? তাহলে আর হোলো কী? এ-বন্দোবস্তটা সেখান থেকে গেলে কাজ দিতো বরং।'

'কেন, কী কাজ দিতো শুনি?' আমি শুধালেম।

'আরে, আমাদের শালা কই? বাংলা মুলুকে তো আমাদের দশ শালীর রাজত্ব! যেকোনো জামাইকেই শুধিয়ে দ্যাখো না! শ্বশুরবাড়ি গেলে খালি শালী আর শালী! সাত বোনের মাঝখানে একটা ভাই হয়ত কোথাও শিবরাত্রির সল্‌তের মত টিম্‌টিম্ করছে, কোথাও তাও নাস্তি! আর, এক ফূৎকারেই তারা নিবে যায়, শালার দাপট কই বাংলায়? তবে হ্যাঁ, শ্যালকরা আছেন বটে বিহারে!'

'কোনোরকম প্রাদেশিকতা হচ্ছে নাতো?' আমার সন্দিগ্ধ সুর।

'আদৌ না। খাঁটি কথা। আচ্ছা বাৎ না হলেও সাচ্চা বাৎ। আমার অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য। শুনতে চাও তো শোনো তাহলে। এই তো কিছুদিন আগের কথা। বেড়াতে গেছি বিহারে—'

'রাঁচি গেছলে তো !' আমি বাধা দিয়ে বলি :—'তাইতো জানতাম।'

'কেন, রাঁচি কি বিহার নয় ? আরে, রাঁচিই তো আসল বিহারভূমি—যতো বাঙালীর আর পাগলের। কে না জানে? যাক্, যা বলছিলাম। উঠেছি এক হোটেলে—লালপুরার কাছে। সার্কুলার রোডের ওপরেই হোটেলটা। ষ্টেশনের রাস্তাটা ঘুরে এসে মিশেছিল হোটেলের কাছটায়। আবার, সেই রাস্তাই আরো ঘোরালো হয়ে চলে গেছে পাগলা গারদের দিকে—কাঁকে রোড ধরে।

'বিকেলে হোটেল থেকে বেরুই। বেড়াতে বেরুই রোজই। সেদিনও বেরিয়েছি। কিন্তু ভাই, বাঙালীর প্রাণ, জানোই তো! পথে নামলেই খোয়া যেতে চায়। কেমন যেন আন্‌চান্ করে! পথে পা দিলেই যেন—'পথভোলা কোন্ পথিক এসেছি, আমায় চেন কি ?' একেবারে পথহারা-ভাব। সর্বদাই খোয়া যাবার পথে।'

'রাঁচির পথে খুব খোয়া বুঝি ?'

'তোমার মুণ্ডু। পথের খোয়া না হে পণ্ডিত, পথের খোয়ার। ঢুকলো কিছু মাথায় ?'

'বুঝেছি। 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?' সেই সব ? নবকুমারদের কপালের কুণ্ডলী ! তাই তো বল্‌ছো ?'

'আমরা কলকাতার মানুষ, অলিতে গলিতে চলতে ফিরতে মেয়ে দেখে দেখে মানুষ। নির্মেয়ে রাস্তায় কি আমাদের পোষায় ? ভালো লাগে কখনো ? কিন্তু আমি যে সময়ে গেছলাম তখন 'সীজন্' ছিলনা। বড়দিন কিম্বা পূজোর হিড়িকে রাঁচি যখন বাঙালী আর বাঙালিনীদের বিহারভূমি হয়ে ওঠে তখন তো যাইনি। আমি গেছি বেটাইমে।'

'ও!' আমি বুঝলাম ঃ 'যখন SHE জন'একদম্ নাস্তি ?'

'না থাক্—হাঁটছি পথ, মনের অবস্থা যাই হোক্! ফাগুনের হাওয়া দিয়েছে, গাছের পাতা সবুজ! আর আকাশ কী নীল! এমন সুচারু দৃশ্যকে সম্পূর্ণ নিখুঁৎ করে তুলতে দরকার শুধু একটি সাথীর! একটি সুন্দর মেয়ে খালি।'

'কিন্তু মেয়েরা কি কখনো খালি থাকে?' আমি জানতে চাই। —'খালি ভেবে এগিয়ে দেখবে শেষে এক খাল। আর, সেই খাল ধরে কুমারীর পিছু পিছু কোনো কুমীর এসে হাজির।'

'চলেছি বিষণ্ণমনে। এমন সময়ে মেঠো পথ পেরিয়ে একটি মেয়ে এসে উঠলো বাঁধা সড়কে। আমার সম্মুখেই। এক সাঁওতাল মেয়ে!

সাঁওতাল শুনে নাক সিঁট্‌কো না ভায়া! এ তোমার সে সাঁওতাল নয়। দস্তুরমতন শিক্ষিত খৃষ্টধর্মের আলোকপ্রাপ্ত সাঁওতাল। দুপাতা ইংরিজি পড়া—মার্জিতরুচি—কেতাদুরস্ত। সাঁওতালের এরা সংস্কৃতরূপ—শোভন রাজসংস্করণ।...'

'রাণী-সংস্করণ বলো।' আমি ত্রুটি সংশোধন করি।

'যা বলেচো। এ-মেয়েটিকে তাই বলতে হয়। শাড়ি ব্লাউজপরার কায়দা—চাল-চলন আর চলনের চাল দেখে তাই মনে হয়। মিশনারীদের সঙ্গে মিশে যেসব নারী গোত্রান্তর লাভ করেছে তাদেরই একজনা বটে। অনেক শ্বেতাঙ্গ এমন মেয়ে বিয়ে করে এখানেই সুখে বসবাস করছেন জানি। বিহারী ভদ্রলোকদের সাথেও বিয়েসাদি চলেছে শুনেছিলাম। এমন কি, এ মেয়েটিকে দেখে—আমারও মনে হোলো যে...'

'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে?'

'প্রথম দর্শনে প্রেম তুমি বিশ্বাস করো? আমার মনে হোলো

যে এমন একটি মেয়েকে পেলে, এমন কি, বাঙালী কুমারীর পরিবর্তে পেলেও আমি বর্তে যাই। এই কালো পরিকে যদি আমার অঙ্কশায়িনী করতে পারি—'

'অঙ্কের কথা তুলোনা, অঙ্ক আমি ভালো বুঝিনে।' আমি জানাই।
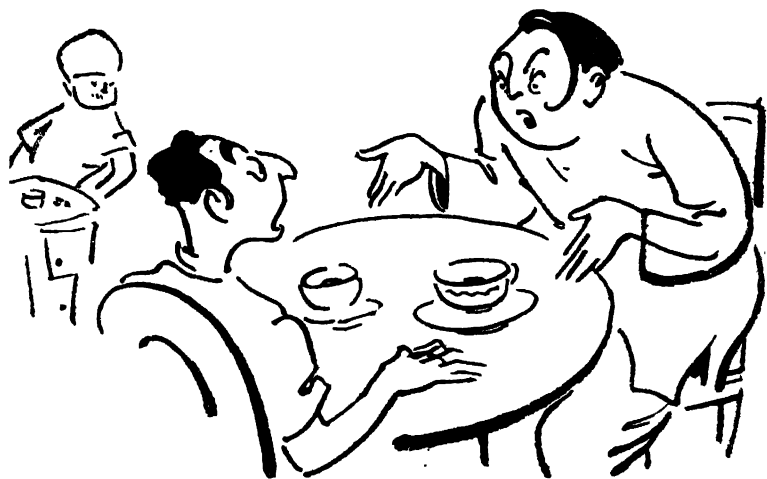
'অঙ্ক না বোঝো, আইন তো বোঝো? তিন আইন? এই মেয়েকে পেলে তিন আইনে বিয়ে করে এখেনেই থেকে যাই। বাংলা আমার মাতৃভূমি, তা ঠিক, কিন্তু বিহারকে জামাতৃভূমি বানিয়ে ফেলি আমার। বিহারের জামাই হয়ে বগোল বাজাই।'

'বগোল নয়, মাদোল।' আমি উল্লেখ করি। না করে পারি না। ডিটেল ওয়ার্কের কোনো খুঁৎ আমার ভালো লাগে না। লেখকেরা এবিষয়ে স্বভাবতই খুঁৎ খুঁতে।

'তা সে যাই হোক!...মেয়েটি চলতে লাগলো আমার আগে আগে।...আমার কথায় তোমার ভাষার কিছু প্রকোপ

দেখা যাচ্ছে, সেজন্যে তুমি কোপান্বিত নও তো? আর কিছু না, এ হচ্ছে শিব্রাম্ চকর্বর্তির সঙ্গে কথা বলার বিপদ।'

'আমার কথা থাক। মেয়েটির কথা বলো।'

'রূপবর্ণনা দেব? কালো বটে, কিন্তু কী শ্রী! আর কালোও নয় ঠিক, নতুন কচি পাতার রঙ! কী তার চেক্নাই! লালিমা নেই বটে, কিন্তু লালিত্য আছে! আর কী বা চুলের গোছা হে! সাপের মতন বেণী ঝুলছে—কিসের সঙ্গে তুলনা দিই? সেই কালো চুলের সঙ্গে মিশে তার দেহসুষমা একমুখে বর্ণনা করে কার সাধ্যি!'

'আর, তোমার আবার একটিমাত্র মুখ।' আমার দুঃখ হয়।

'হ্যাঁ।...বাঙালীর মেয়ে রূপসী আমি মানি, বঙ্গললনার মিষ্টতার তুলনা হয় না তাও সত্যি, কিন্তু এই সাঁওতালদুহিতার এহেন সুগঠিত দেহ—এইরূপটি বাঙালীর ঘরে বিরল! এ যেন ভাস্করের খোদাই, পাথর কুঁদে বানানো। এই সৌষ্ঠব—একে বাংলা ভাষায় যে কি বলে, আমার জানা নেই। তুমি জানো?'

'ঠিক সুঠাম বাংলাটি জানিনে।' আমায় বলতে হয়।

'সুঠাম! হ্যাঁ, সুঠামই ওর বাংলা। অনেক সুন্দর মেয়ে আমি দেখেছি তারা শুধুই সুন্দর, কিন্তু সুঠাম নয়। এ মেয়ে সুঠাম, আর সুঠাম বলেই সুন্দর। এক কথায় অপরূপ।... মেয়েটি আমার আগে আগে হাঁটছিল। আমি আগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গ নিলাম।....

'আহা, কী তার হাতের গড়ন হে! যেমন চওড়া হাতের কব্জি তেম্নি...না, মোটেই পেলব নয়, কিন্তু তাহলেও এমন হাতাবার মত হাত কখনো দেখিনি। পাণি-গ্রহণের যোগ্য বটে। আর তার পা? বাংলা করে পা বললে কিছুই তার বলা হয় না। বাংলা ভাষায় তার পদোচিত মর্যাদা নেই!

হিন্দি করে 'গোর' বললে হয়তো কিছু তার প্রকাশ পেতে পারে।'

'গোরুর মতন ক্ষুরধার বুঝি ?'

'গোর মানে কবর। ওর গোর, মানে আমার গোরস্থান। ঐ শ্রীচরণেই যেন আমার মরণ। প্রতি পদক্ষেপেই। কেষ্ট যে কেন শ্রীরাধার পদপল্লবমুদারম্ মাথায় করে মরতে চেয়েছিলেন আর শিব যে কেন শ্যামার পায়ের তলায় মরে আছেন তার মর্ম বোঝা যায় সেই পা দেখলে।'

'পা, না, পায়ের গোড়ালি ?'

'গোড়ালি কিম্বা কবর—সেই পা। কিন্তু আরেক কবর ছিলো তার মাথায়—তার কবরী। কবরী কাকে বলে জানো তো ? বলেছি না তোমায়, সাপের মতন বেণী তার পিঠের ওপর পড়েছে ? তার সেই চুলের গোছা। আহা !…'

'আহা ! তারপর ঐ সব আহা উহুর পর ?' আমি কবরের পরে—কাবারের খবরে আসতে চাই—'তোমার আহার-পর্বের পরে ?'

'মেয়েটার আমি সঙ্গ ধরলাম। আমার পায়ের আওয়াজ পেতেই সে ফিরে তাকালো ! আহা, কি সুন্দর যে সেই চোখ, ভাই ! চোখ না আঁখি, কি বলে ! কী মধুর তার দৃষ্টি ··দেখলাম সিঁথেয় তার সিঁদুর নেই !'

'অদূরদৃষ্টিও ছিলো তোমার তাহলে ? কিন্তু কৃশ্চান হলে কি সিঁদুর থাকে নাকি ?'

'ওখানকার সাঁওতালরা এক অদ্ভুত জাতের কৃশ্চান্। কালীপূজাও করে, আবার মুর্গীও বলি দেয়। মিশনারীদের মানে, আবার মা শেতলাকেও। হিঁদুয়ানি-সিঁদুরে তাদের মানা নেই…'

'মালুম্ হোলো। ততঃ কিম্ ?'

'মেয়েটি হাসলো আমার দিকে তাকিয়ে। হাসতেই, মুক্তার মত ঝক্‌ঝকে তার দাঁতের সারি…'

'বলতে হবেনা আর। মুক্তহাসি, বুঝতে পেরেছি। আর সেই হাসিতেই, সোজা কথায়, দাঁত বসালো তোমার মনে।'

'সেই হাসির সামনে পড়ে প্রথমে আমার জিভ যেন জড়িয়ে গেল। কথা বলবার কোনো শক্তি রইলো না। তার পরে জিভ একটু আল্‌গা হতেই ওর নাম জিগেস্‌ করলাম। ও বললে, সুম্‌রি। হামার নাম সুম্‌রি।'

'আহা, কী মধুর নাম !…তোমার হয়ে আমিই বলে দিলাম। কিছু মনে করো না।' আমি বল্লাম।

'সুম্‌রি মানে সুন্দরী—রাষ্ট্রভাষায় নয়, সাঁওতালিতে। কিন্তু তাহলেও সারা রাষ্ট্রে—আমরি বাংলা ভাষায় ভাসা ভাসা ভাবেও সুন্দর বোঝাতে সুম্‌রির জুড়ি নেই আমি বলব। এত মিঠে নাম আমি শুনিনি আর এমন চালে বললো সুম্‌রি…'

'যেন ঠুংরির চাল !'

'ঠিক। আমি ওর পাশাপাশি চলতে লাগলাম গল্প করতে করতে। কতো কী গল্প ! ফাঁকা রাস্তায় চলছি দুজনায়, কেউ নেই কোথ্‌থাও। সাহসী হয়ে সহসা ওর হাতটি আমার মুঠোর মধ্যে নিলাম। ও কোনো বাধা দিল না।…আমার মন অবশ্যি আমার হাতের নাগালে ছিলনা। এগিয়ে গেছল অনেক—অনেক দূর। আমার হাতের বাইরেই চলে গেছে তখন।…

এমন সময়ে এক তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব টের পাওয়া গেল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, হাত পাঁচেক দূরে একটা বাচ্ছা। সাঁওতাল বাচ্ছা। বাচ্ছাটা সাগ্রহে আমাদের লক্ষ্য করছিল।'

'তীর ধনুক নিয়ে ?'

'না, এম্‌নি শুধু হাতেই। আমি সুম্‌রির দিকে চাইলাম।

সপ্রশ্ন নেত্রে। 'ইয়ে কৌন্ হ্যায় ?' সুমরি বললে ওর ভাই। মেরা ভাইয়া শুনতেই আমার টনক্ নড়ল। ছেলেটাকে ডেকে ওর হাতে একটা আধুলি দিলাম! পেতেই, ধনুকের ছিলা ছেড়ে তীর যেমন আবেগভরে বেরোয়, তেম্নি এক ছুটে নিমিষের মধ্যে সে হাওয়ায় মিশে গেল। হাওয়া হয়ে গেল!

আমার ভাবী শালাকে ভাগাবার পর আবার আমরা আগাই। এবার আমি একটু বেশি এগিয়েছি। গল্পের ফাঁকে আল্‌তো ভাবে জড়িয়ে ধরেছি ওকে। ওর তরফ থেকে কোনো বাধা এল না। সাঁওতালের মেয়েরা, সত্যি বললে, বেশ উৎসাহপ্রদ বলতে হয়। সাধে কি আর সুসভ্য শ্বেতাঙ্গরাও মেম্ ফেলে ওদের বিয়ে করে সাদা সাঁওতাল বন্‌ছে? জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে তাকে আমার কাছে টেনেছি, তার চুলের গোছায় হাত দিয়েছি, কপালে আর কপোলে আঙুল বুলোচ্ছি, আদরে ওর চোখ বুজে এসেছে—হয়ত বা আরো সমাদরের অপেক্ষাতেই··· এমন সময় পেছনে ফের কার পায়ের আওয়াজ···

চুলের ফাঁস থেকে আমার হাত খুলে নিলাম, আর ওর গালের পাশ থেকে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম আড়চোখে। ঠিক আমাদের পেছনেই, আরেকটি বাচ্ছা। আগের নমুনার আরেকটি। কিন্তু তার হাবভাব আরো গম্ভীর। সুম্‌রির দিকে ভুরু তুলতেই জানা গেল······ওর আরেকটি ভাই! বালকটির দিকে চেয়ে মধুর হাসি হাসলাম—যদিও মনে মনে ইচ্ছে হচ্ছিল দিই ছোঁড়াটাকে এক ধাক্কা! মোরাবাদী পাহাড়ের মাথায় তুলে ফেলে দিই গোড়ায়—চূড়ার থেকে গুঁড়া করে ফেলি। একটা চূড়ান্ত করে ছাড়ি। একটাকে অন্ততঃ। কিন্তু না, সেরকম অর্দ্ধচন্দ্র না দিয়ে একটা আধুলিই দিলাম। আরেকটা আধুলি। দিতেই সেও উধাও!

এতক্ষণে বেলা পড়ে এসেছিল। সূয্যি ডুবু ডুবু। সন্ধ্যে হব হব। ঠিক যাকে বলে মধুর সন্ধিক্ষণ!...স্বরসন্ধি তো অনেকক্ষণই হয়েছে। কথায় কথা গড়িয়েছে বহুৎ। এখন এই গোধুলি-লগ্নে অন্য সন্ধির ষড়যন্ত্র করলে কেমন হয়?...পথের

ধারে পাথরের একটা টিলার ওপরে গিয়ে বসলাম। ভাবছি এবার বিয়ের কথাটা পাড়বো। কিন্তু কি করে পাড়ি?......'

'ডিমের মতই। বিয়ে না ডিম্, এই মনে করে পাড়বে।' আমি বাৎলাই—'পেড়ে ফেলবে পত্রপাঠ, আবার কি ?'

"তোমরা লেখকমানুষ, তোমাদের ভাষায় কুলোয়—আমি ভাই, ভাষার কূল পাই না। তোমাদের ভাষা নিয়েই আমাদের কারবার। তার ওপরে এখন আবার রাষ্ট্রভাষায় বাৎচিৎ চালাতে হচ্ছে। কিন্তু প্রেমের কথা কি রাষ্ট্র করার উপযুক্ত ? পণ্ডিতজীরাই বলতে পারেন! আমি যে কি করে কথাটা ওর কাছে রাষ্ট্র করি কিছুতেই তার ঠাওর পাচ্ছিলাম না। কথায় বলে, লাখ কথা না হলে বিয়ে হয়না. কথাটা খাঁটি!'

'আরে, এই জন্যেই তো ঘ-TALK লাগে!'

"লাগুক, কিন্তু লাখ কথা দূরে থাক, একটা কথাও আমার কাছে লাগসই ঠেকল না। ভাঙা হিন্দিতে বলতে গিয়ে বিয়ের ইয়ে হয়ে যায় যদি? সম্বন্ধ যদি গোড়াতেই ভেঙ্গে যায় ? ভেস্তে যায় সব ? অবশেষে ভাবলাম, মুখের ভাষায় যাকে ধরা যায় না, তাকে না হয় অধরের ভাষা দিয়েই ধরি। কথাটাকে মৌখিক করে ফেলি। চুমু দিয়েই গেরেপ্তার করি ওকে ? ...তাই করতে যাচ্ছি এমন সময়ে···আবার সেই গেরো!' দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লো সমর।

'ওরফে গেরোন। চাঁদ থাকলেই গেরোন থাকে। জানা কথাই।' আমি সান্ত্বনা দিই।

'আরেক খুদে শয়তান। না শুধোতেই সুমুরি ঘাড় নাড়লো —জানালো যে তারই ভাই। আউর্ এক ভাইয়া। পকেট হাতড়ে আরেকটা আধুলি বেরুলো। তারপরে আধুলি আর আপদ এক সাথে বিদেয় করে নিশ্চিন্ত হয়ে চুমু খেতে যাচ্ছি ···আবার এক! ···তারপর আবার···আবার আরেক···তার ওপরে ফের...আবার আবার আরেকজন...চুমু দেব কি···'

'চুমুৎকৃত হয়ে গেছো নিজেই ?'

"অক্ষরে অক্ষরে। পরমহংসদেব কেন যে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে বলেছিলেন টের পেলাম তখন। কিন্তু কামিনীকে

ছাড়া তো আমার পক্ষে সম্ভব না। কামিনীর জন্যে কাঞ্চন ছাড়তে পারি। তাই ছাড়লাম···কাঞ্চনমূল্য ছড়াতে লাগলাম চারদিকে···রূপো, নিকেল, তামা ··সিকি, দুয়ানি, ডবল-পয়সা, যা ছিলো পকেটে—তামাম্ দিলাম বিলিয়ে। আমার সেই হবু শালাদের। দুহাতে বিলোলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত ছিল। কিন্তু তখনো সুমুরির ভ্রাতৃবাহিনীর অন্ত নেই। তখনো তারা আসছে —আসছেই! তখনো চারপাশে আমার পদধ্বনি। মনে হোলো আমি যেন টিলার ওপর থেকে খসে পড়েছি। না, পড়িনি ঠিক, কিন্তু পড়ে গেলে যা দশা হোতো তাই হোলো আমার! আমার যাকিছু ছিলো খস্‌লো। না পড়েই হাড়গোড় ভাঙ্গা দ হলাম।' সমর বললো।

'বিহার-ভূমি সমরাঙ্গন হয়ে উঠলো—এক কথায় ?'

'হুবহু। আমার শালাদের সৌজন্যে। তখনো দেখি তারা আসছে। মাটি ফুঁড়ে উঠছে, কি আকাশ থেকে উড়ে আসছে, না কি, গাছের ডাল থেকে নামছে—কে জানে! মোটের ওপর তার তাল সামলাতে—তাল কিংবা সাঁওতাল যাই বলো—আমি তো বান্‌চাল! বিয়ের আগেই আমার তালাক্! দেখলাম সেই তল্লাটের যতো খুদে খুদে বাচ্চা সবাই ওর ভাই। সুমূরির দেহের খোদাই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম! কিন্তু ওর বাবার খোদ্‌কারি যে আরো চমৎকার তা আমার ধারণা ছিলনা! আমার পকেট ফাঁক হয়ে গেল কিন্তু ওর ভাইয়ের এক ভগ্নাংশকেও···পয়েণ্ট জিরো জিরো জিরো এক অংশকেও—'

'আবার আঁক?' আমি আঁৎকে উঠি—'জিরোতে চাও তো জিরোও, কিন্তু আঁক কেন? ডেসিমলের আমদানি কিসের জন্যে? সুমূরিকে চুমৃত করছিলে—তার কী হোলো?'

'কিছুই হোলো না। সে-ইচ্ছা আমার ধূলিসাৎ হয়ে গেল। দেখলাম, আমার ব্যাঙ্কের সব টাকা তুলে এনে যদি আধুলিসাৎ করি তাহলেও আমার রজতখণ্ডের চেয়ে ওর ভায়ের সংখ্যা বেশি হবে। তাই বলছিলাম, যদি দশশালার ব্যবস্থা দূর করতে হয় তাহলে গৌড়বঙ্গ নয়, বিহার থেকেই তার দৌড় হোক। তা নইলে বিহারভূমি কোনোদিনই নিষ্কণ্টক হবে না।'

আট

৯ [illegible]র যেন ডিগ্‌বাজি খায়

বিয়ে বাড়িতেই মেয়েটির সাথে আলাপ।

বিয়েটা ভারী সরকারী চাকুরের মেয়ের। কিন্তু আপ্যায়নটা হাল্‌কা। শুধু চা আর সরবৎ। একেবারে আইন্‌মাফিক্‌। রেশনের কানুনে যেমনটি বরাদ্দ, সরকারের একজনা হয়ে তার অঙ্গচ্ছেদ—মেজর অপারেশন তো তিনি করতে পারেন না!

কিন্তু তাতেই বা কা? ভিম্‌টোও তো ছ' আনা দিয়ে খেতে হয়। সেই কথা ভেবেই তা-ই আমি ন' গেলাস উড়িয়ে দিলাম। হিসেবী ভদ্রলোকের সমস্ত হিসেব নয়ছয় করতে লাগা গেল।

ভিম্‌টো ছাড়াও লাইমেড, লেমোনেড্‌, জিঞ্জারেল্‌, অরেঞ্জেড—এসব তো আছেই! কিছুমাত্র দ্বিধা না করে—দুঃখ না পুষে—জলাঞ্জলি দিতে লাগলাম নিজের, এমন কালে সেই মেয়েটির সাথে দেখা।

বেয়ারারা সরবতের ট্রে নিয়ে ঘুরছিল—ঘুরতে-ফিরতেই আমি চাখছিলাম। কিন্তু জলবৎ তরল জিনিসও খালি খালি পেটে পড়লে খোল ভর্তি হয়ে ভরাডুবি ঘটাতে পারে। ক্রমাগত জলে জল বাধলে—তার বাধ্যতায় তলাতে বেশিক্ষণ লাগে না। নিমজ্জমান আমিও একটা বসবার জায়গা খুঁজছিলাম।

প্রকাণ্ড সামিয়ানার তলায় অগুণতি টেবিল চেয়ার—অতিথি-সজ্জনে জমাট্‌। একখানা চেয়ারও ফাঁক নেই কোনোখানে। শুধু এক কোণের একটা টেবিলে একটিমাত্র মেয়ে একলাটি বসে। তার পাশের আসনটি ফাঁকা।

আমসত্ত্বের সরবৎ হাতে ঘুরতে ঘুরতে সেখানে গেলাম।

'এই সীট্‌টি কি খালি আছে?' শুধালাম মেয়েটিকে।

আর, সে ঘাড় নাড়তেই আমি বসে পড়েছি। সেই সন্ধ্যে থেকে এখন অব্দি সতের গ্লাস সরবৎ হাতাতে কতো ঘুর্‌পাক্‌ যে খেতে হয়েছে! শুধু জলপথেই মাইল দশেক ঘোরা হয়েছিল, একটু না নোঙর নিলে চলছিল না। আর, সত্যি বলতে, যতই ঘুরছিলাম—ক্রোশের পর ক্রোশ—জলে নামছিলাম যতই না—ততই যেন জ্বলে উঠছিলাম আরো। জলযানগুলি সরবতের ট্রে নিয়ে কাছাকাছি এলেই আক্রোশ ঝাড়ছিলাম তাদের উপর।

কিন্তু এখন একটু বসতে হয়। খিদের জ্বালা মেটাতে না

হয় জলের জালাই হয়েছি, এবার একটু বসে বসেই চালানো যাক্‌। সরবৎরা যেমন না নড়ে চড়ে বরফ গলাচ্ছে আমিও তেম্‌নি বসে বসেই সরবৎ গলাই—গলাধঃকরণ করি ওদের।

'আপনার সঙ্গীটি কোথাও গেছেন বুঝি? তা, তিনি এলেই আমি উঠে পড়বো। তৎক্ষণাৎ।' মেয়েটিকে আমি আশ্বাস দিই।

'আমার সঙ্গে কেউ নেই তো। আমি এ বাড়ির মেয়ে।' সে জানালো।

জেনে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। মরুভূমিতে কেবলি যে মরীচিকা নেই, ওয়েসিস্‌ও রয়েছে—একথায় আমার বিশ্বাস গজায়।

'আপনার বোনের বিয়ে বুঝি?' ওয়েসিসের সাথে আলাপ জমাবার পথ খুঁজি। মরূদ্যানের পাড়ে বসে কথা পাড়ি।

'আমার বোন্‌ঝির বিয়ে। আমার বড়দির মেয়ে মঞ্জুর।'

'ও!' কিন্তু অতঃপর আর কী বলা যায়? মাথা চুলকাতে হয় আমায়।

'আপনার কোনো বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, আমাদের কলেজের একটি মেয়ে আসবে। আমার বন্ধু।'

মঞ্জুর বিয়ের কথার মতো এ-কথাটাকেও মঞ্জুর করতে হয়। কিন্তু এ-খবরে বলতে কি, মনের জোর আমার কমে যায় অনেক। ক্ষণেকের এই আসন বুঝি টলে যায়।

'ভাগ্যিস, আসতে তিনি দেরি করছেন তাই একটু বসা গেল এখন। আপনার পাশটিতে—এখানে।'

বলে আমি একটু হাসলাম। কিন্তু সে কোনো জবাব দিল না। খানিক পরে আমিই ফের মুখ খুলি—'মেয়েদের

ঐরকমই। কিছু মনে করবেন না, সাজ গোছ করতেই এত সময় যায় ওঁদের!'

অবশ্যি, দেরি করে এলেও বাঞ্ছিতরূপেই দেখা দেন সে কথা সত্যি! কিন্তু সেকথাটা বলা বাঞ্ছনীয় হবে কিনা ভাবি। কেননা, মেয়েলি রূপসজ্জায় এই লেট্ খাওয়া আরেক মেয়ের কাছে কেমন উপাদেয় হয় কে জানে! ছেলেদের কথা বলতে পারি। তাদের বেলা এ-সাজা দস্তুরমতই সাজা। তাহলেও, মেওয়া আর মেয়ে দুয়ের মধ্যেই বেশ মিল আছে। শুধু ধ্বনিসাদৃশ্যই না—দু'জনাই বেশ সবুরে ফলেন!

কিন্তু এতরকম সাজলেও, সাজতে পারলেও, আধুনিকারা পান সাজতে জানেন না!—একথাটাও বলতে হয়। কিন্তু সেকথা আমি আর মেয়েটিকে বলি না। যেকথা বলেছি তারই কোনো প্রতিধ্বনি পাইনি সেখান থেকে।

চুপ্‌সে রয়েছে সে।

পাশ দিয়ে এক ট্রে পটাটো চিপ্‌স্ যাচ্ছিল, বেয়ারার হাত ধরে পট্ করে তার থেকে এক মুঠো তুলে নি চট্ করে। তুলে নিয়ে মর্ম্মড়-ধ্বনি তুলি নিজের মুখে। চিবুতে চিবুতে বলি—'এগুলি খেতে বেশ কিন্তু। কী বলেন?'

'হ্যাঁ।'

'দেব আপনাকে চারটি?'

'না। ধন্যবাদ।'

চ্যারিটি-দানের বাধায় আমি দুঃখিত হইনে, অম্লানমুখে বলি—'অবশ্যি আপনাদের বাড়ি, আর আমিই অতিথি। তাহলেও আপনার জন্যে এক গ্লাস ঘোলের সরবৎ আনতে বলি, কেমন?'

'না থাক্।'

'তাহলে সব রকম মিশিয়ে একটা সরবৎ মিক্‌চার বানানো যাক্‌, কী বলেন ?'

'না না। কোনো দরকার নেই।'

তাহলে ঘোল ? কিন্তু না, ঘোল খেতেও মেয়েটি নারাজ।

'আমি নিজের জন্যে আনাই যদি—? একলা একলা খেলে আপনি পেটুক বলে ভাববেন না তো ?'

'না না। তা কেন ভাববো ?'

'আমি ভাবছি, আর সবাই কী ভাববে। অন্য টেবিলের অতিথিরা। তারা ভাববে যে—' ইতিমধ্যে ঘোলের গেলাস এসে পড়তেই আমি আর ভাবতে পারি না। গোলমাল রেখে ঘোলমাল নিয়ে মাতি।

'আপনার দিদির বর—ভদ্দরলোকটি বেশ ভদ্রলোক।' ঘোলের সরবৎ খেয়ে আলাপের সরোবরে আবার আমি ঢেউ তুলি। নিস্তরঙ্গ জল ঘোলাই।

'হ্যাঁ।'

'দিদিটিও ভালো।'

'হ্যাঁ।'

'আর, আপনার বোন্‌ঝি, মঞ্জু না কী নাম বল্লেন না ? এত সুন্দর যে বলাই যায় না !'

'হ্যাঁ।'

যতই না আমি সারকথা পাড়ি, ও এক কথায় সারে। ভদ্র (স্ত্রী) লোকের এই এককথাকে সারাতে পারে সারাৎসার এমন কোনো কথাই আমার ধারণায় আসে না। এমন অবাক্‌-পটু মেয়ে আমার জীবনে এই প্রথম। অবাক হতে হয় আমাকেই।

বাস্তবিক, এই টুক্‌রো কথার কারবারের মত বেখাপ্পা আর

হয় না। একটু না এগুতেই, মরুপথে-গিয়ে-পড়া নদীর মতই নিঃশেষ! কথার পিঠে কথা না পড়তেই দাঁড়ি। ভাব না জমতে জমতেই আড়ি। স্বুরুর আগেই খতম্।

'আজ দিনটা কি রকম ভ্যাপ্সা গুমোট দেখছেন?'

'হ্যাঁ। বিচ্ছিরি।'

'কদিন ধরেই এরকমটা যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ।'

এর পর ফের কী বলা যায়? দিনের পর দিন একঘেয়ে ঘ্যান্ঘ্যানানি ভালো লাগে? দৈনন্দিন এক কথা কি টানা যায়? আমাদের এমনকিছু দাম্পত্য সম্পর্ক নয় যে—? থামতেই হয় আমায়।

আবার চুপচাপ কিছুক্ষণ।

'কই আপনার বন্ধুটি তো এখনো এলেন না?'

'কেন যে এত দেরি করছে!'

যাক্, এতক্ষণে তবু একটা লম্বা কথা পাওয়া গেল। অবোলা মেয়ের মৌচাকে ঢিল মেরে একটু বাক্যমধু-র স্বাদ পেলাম, মধুর বাক্যের মধুপ-গুঞ্জন শোনা গেল কিঞ্চিৎ।

'কোন্ কলেজে পড়েন জানতে চাওয়াটা হয়তো আমার পক্ষে অন্যায় হবে?' এবার আমার পড়ার কথা পাড়া। কলেজপাড়ায় পড়া।

'না।'

'কোন্ কলেজ?'

'বেথুন।'

'খুব নামকরা কলেজ। কিন্তু আপনার নামটি যদি জানতে চাই তাহলে হয়তো আপনি রাগ করবেন?' ভরসা করে আরো একটু এগুলাম।

'না। রাগবো কেন?'

'নামটা কী তাহলে জানতে পারি?'

'সুচরিতা। সুচরিতা সেন।'

'বাঃ, বেশ নাম।'

কোনো জবাব এলো না। কেবল হাসির একটু ফিক্‌ব্যথাই যেন দেখা গেল ওর ঠোঁটের কোণে।

'আপনার বোনঝির নামটিও বেশ।'

'হ্যাঁ, মঞ্জুলিকা রায়।'

'তবে এ রায় অবশ্যি পালটাবে। উচ্চতর আদালতের বিধানে পালটে যাবে—আজ রাত্রেই।'

এবার হাঁ-র বদলে একটুখানি হাসি।

কিন্তু এইভাবে কতো আর হাঁকানো যায়? ভাবের পথে ক্রমাগত বেড়ার পর বেড়া টপকে যাওয়া—টপকাতে টপকাতে যাওয়া—আর যাই হোক, সহজভাবে বেড়ানো না। যে কথা এক কথাতেই খতম্—একটু জবাবের সাথেই একেবারে জবাব, (কিম্বা জবাই, যাই বলুন) খেই ধরবার আর কিছু থাকে না তারপরে, তার মতন অকথ্য আর কী আছে?

অথচ, আরো কতো টেবিলেই তো কতো না নরনারী! সদ্যআলাপিতারাও কি নেই ওর ভেতরে? সদ্যপরিচিত অত্যন্ত পরও কি কেউ নেই ওর মধ্যে—আপন করার অধ্যবসায়ে এখন অপর কাউকে? অথচ, কি করে তারা আলাপে আলাপে এগুচ্ছে! লাফে লাফেই এগিয়ে যাচ্ছে। হাসতে হাসতেই। কথার পর কথায়, LAUGH-এর পর LAUGH-এ—S-MILES AFTER S-MILES! কেমন করে, কে জানে!

টেবিলে টেবিলে কলতান, কাকলি-হাসি! চারিপাশে

জমাটিভাব ওতোপ্রোতো। কথার স্রোত বয়ে চলেছে ছল্ ছল্ করে! ছলনার সুরধুনী। চক্‌চক্ করছে মুখর চোখ, বক্‌বক্ করছে চোখালো মুখ। মেয়েরা—ছেলেরা। মেয়েদের—ছেলেদের! আর, ঐ যতো ঝক্‌ঝকে চোখ—TALK-TALK-এ মুখ মেয়েছেলেদের!

কিন্তু এখানে অন্য না-TALK—আমার সামনে। তাবলে এত শীগ্‌গির যবনিকাপতন হতে দিলে তো চলে না। অগত্যা আমাকে আলাদা দৃশ্যপট আনতে হয়—

'আজকের খেলার খবর জানেন?'

'না তো।'

'মোহনবাগান জিতেছে।'

'তাই নাকি?'

মোহনবাগান জেতায় ইষ্টবেঙ্গলের কতোটা অনিষ্ট হোলো আমি বোঝাতে যাই। ইষ্টবেঙ্গল উপরো-উপরি দু' বছর লীগ আর শীল্ড নেবার পরে এবারো যদি সেই কাণ্ড বাধাতো তাহলে সেই পুনরুক্তি কতদূর শোচনীয় হোতো (অন্ততঃ, মোহন-বাগানের তরফে) তার কুফলটা আমি ফলাও করি। সব শুনে টুনে সে বলে—কিছুই বলে না—শুধু হাঁ করে থাকে। একটুও হুঁহাঁ না করেই।

এরপর আমাকে হাল ছাড়তে হয় বাধ্য হয়ে।

না, এমন করে এগুনো যায় না। এবার ওর মতই এক কথায় জবাব দিতে হয়—ওকেই। দিতেও কোনো বাধা ছিল না, কিন্তু মাটি করেছে মেয়েটি—মেয়েটি সুন্দর হয়েই! আসল মুস্কিল আমার সেইখানেই।...

এতক্ষণের শীতল জলধারার পর একটু গরম চায়ের পিপাসায় হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। চাতকের মতই তৃষিত হয়ে উঠেছিলাম, বলতে কি! চায়ের ফরমাস দিয়ে আবার আমি মেয়েটির গায়ে পড়ি—

'আপনার জামাইবাবুর এই বাড়িখানি বেশ।'

'হ্যাঁ।'

আবার মেয়েটির সেই গায়-না-মাথা ভাব। অগত্যা, আর কিছু না, খালি ছন্দ বজায় রাখার খাতিরেই আমায় বলতে হয়—'আর, আপনার এক শাড়ীখানিও খাসা!'

'সত্যি? সত্যি বলছেন? সত্যি বলছেন আপনি?' মেয়েটি যেন লাফিয়ে ওঠে—'জানেন, ফ্যাশান্ হাউসের লেটেস্ট্ ডিজাইনের এটা? এরকম আর একখানিও আপনি পাবেন না। একদম্ নেই কলকাতায়। জরির এমন কাজও খুব কম দেখবেন। খুব কম মেয়ের গায়েই। দেখুন না আপনি, এখানে তো

এত মেয়ে, তখন থেকেই আমি দেখছি তো বসে বসে—এরকমটি নেই আর কারুর। সেদিন যখন ওদের দোকানে মডেলের গায়ে এটা জড়িত দেখলাম—তখন—তখনই আমি দেখেই না লাফিয়ে উঠেছি! আপনমনেই বলেছি, না, এ-শাড়ী

না হলে আমার চলবে না। একদণ্ডও না। তক্ষুনি আমি বাড়ী ফিরে মাকে বললাম—বললাম পিসীমাকে। তারপরে টাকা নিলাম বাবার কাছ থেকে। নিয়ে সোজা চলে গেলাম ফ্যাশান্ হাউসে—কিনলাম তক্ষুনি। তা, বেশ—দাম একটু বেশীই বলতে হবে, তা হোক্! দেখছেন তো বাজার কেমন আজকাল! সামান্য একটা মিলের শাড়ীই মেলে না, আর এমন একখানা

—এ জিনিষ কখনো হাতছাড়া করে ? আর, দোকানে তখন এরকমের মোটে এই একখানাই ছিলো। আর দেখুন না! কী চমৎকার রঙএর! নক্‌সাগুলিও নতুন ধরণের নয় কি? ধারগুলোর কাজটাও দেখুন! কেমন নতুনধারা। সবদিক দিয়ে আপটুডেট্। যেমন হতে হয়। যেমন চমক্ তেম্‌নি চটক্। দোকানে দেখে গিয়ে তারপর ফিরে এসে না যদি এটা পেতাম তাহলে সে-দুঃখ আমার জীবনে যেত না। মন খারাপ হোতো এমন! এগ্‌জামিন্ ফেল্ করলেও এত কষ্ট পেতাম কি না সন্দেহ! আহা, কেমন জম্‌কালো জমি! কেমন বুটিদার! কী রঙ! এ-রঙটা যে শুধু আমার মনের মত তাই নয়, আমার ব্লাউজের সঙ্গে, আমার জুতোর সঙ্গে অব্দি এমন ম্যাচ করে। মঞ্জুলি অবশ্যি শ' চারেক শাড়ী পেয়েছে বিয়ের প্রেজেণ্ট—আমি খুঁটিয়ে দেখেছি—তার মধ্যে এমনটি একটিও নেই। তখন থেকে আমি বসে রয়েছি কখন শেফালী আসে! এলে তাকে দেখাই! দেখিয়ে তাক্ লাগিয়ে দিই তাকে। (কে বলে এখনকার মেয়েরা PUN সাজতে জানে না?) হ্যাঁ, আজই এখানা প্রথম পরলুম কি না। তা—তা আপনি বলছেন যে—? আপনার শাড়ীটা বেশ পছন্দ হয়েছে?'

'অ্যাঁ—হ্যাঁ!...'

আমি হাঁ করে ওর কথা শুনছিলাম। ইতিমধ্যে আমাদের টেবিলে দুধ, চিনি, চায়ের লিকার্ এসে পড়েছিল। কেট্‌লি থেকে পেয়ালায় ঢালছি লিকার্—ঢেলে দুধ চিনি মেলাতে যাবো—কিন্তু কথার তোড়ে ইচ্ছামতীর বাঁধ ভেঙেছে কখন্—সব ভুলে হাঁ করে তার তরঙ্গভঙ্গ দেখছি—হঠাৎ প্রশ্নাহত হয়ে হাঁ করতেই চায়ের লিকার্ চল্‌কে উঠলো। চল্‌কে গিয়ে পড়লো আমার গায়েই।

আমি লাফিয়ে উঠলাম। লিকারের জ্বালায় উল্‌টে পড়ছিলাম, ৯কারের মতই ডিগ্‌বাজি খেতাম আরেকটু হলে—কিন্তু খুব সাম্‌লে নিয়েছি বরাতজোরে।

'হ্যাঁ। সত্যি বলছি, এমন শাড়ী আমি দেখিনি। আপনাকে ছুঁয়ে বলতে পারি। তা—আপনাকে একটু চা দিই?'

'দাঁড়ান্‌। আমি করছি চা। করে দিচ্ছি আপনাকে।'

বলা বাহুল্য, আমি আর দাঁড়াই না। বসে পড়ি তারপরই

[নয়]

এক্কা গাড়ি খুব ছুটেচে

প্রেমের ঠেলায় শুনেছি কেউ কেউ রাঁচি যায়। আবার রাঁচিতে গিয়েও প্রেমের ঠেলায় পড়ে এমন লোকও আছে !

তেমন একটি অভিব্যক্তি, দুঃখের বিষয়, এই আমিই !

লালপুরা হোটেলের গেটে মেয়েটিকে ঢুকতে দেখেই আমার মনে হোলো...মনে হোলো যে আমি আর হোটেলের এলাকায় নেই, অলকায় !

মনে হোলো যে এই মেয়েটির সঙ্গে, আদ্যিকালের বা তারো আগের থেকে আমার আত্মীয়তা ! অনাদি-সূত্রে আমরা জড়িত। অফুরন্ত কালের জন্যই।

এ-ভাবটা আমার প্রায়ই হয়। সুন্দর মেয়ে দেখলেই হয়ে থাকে। দুঃখের কথা, সুশ্রী মেয়েরা কিছু ঝাঁকে ঝাঁকে দেখা দেয় না, বেশ কিছুদিন বাদ বাদ এসে থাকে। সময়ের গড়পড়তার হিসেবে হয়ত তিন মাস পর পর হবে, কিন্তু মনের দিক দিয়ে খবর নিলে এক যুগ অন্তর অন্তর মনে হয়। এইভাবে যুগে

যুগান্তরে ঘটা করে তারা আসে, আর আমার অন্তরবিপ্লব ঘটায়।

প্রত্যেক বারেই আলাদা আলাদা মেয়ে, বলাই বাহুল্য। গানের অন্তরার মতই প্রাণের এইসব অন্ত-রা—এই প্রাণান্তরা—সুন্দরীদের এই আগমনী আর অন্তর্দ্ধান। এক একটা মন্বন্তরের পর এক একজন মানসী। অবশ্যি, মানসী এলেই—কিছু মেলেনা; তার মাঝেও অন্তরায় আছে। কিন্তু থাকলেও, অন্তরালে—মেঘের আড়ালে—চাঁদ তো থাকেই?

সুন্দরী মেয়েরা, আমি দেখেছি, ঠিক সর্দির মতই। মাঝে মাঝেই তারা দেখা দেবে, নিয়মিতভাবেই—কিছুতেই এড়ানো যাবে না। যতই সাবধানে থাকো, লাগবেই। সর্দিরা নাকে আর সুন্দরীরা চোখে। এবং, লাগলেই আর রক্ষে নেই!

আর, লক্ষণও প্রায় এক। সর্দি লাগলে নাক সুড়সুড় করে, হাঁচি আসে। সুন্দরীর বেলায় গলা সুর সুর করে—গান আসে। সর্দির মতই তা নাক দিয়ে বেরোয়, তেমনি নাকানি-চুবানি। চোখ মুখ লাল দু-বেলাতেই। সর্দি নাকের জল আনে, সুন্দরীরা চোখের জল। সর্দির টানে নিউমোনিয়া আসতে পারে, আর সুন্দরীর টান? সেও কিছু পুরণো ম্যানিয়া নয়। তার ওপর, সর্দি আর সুন্দরী যদি একসাথে লাগে তাহলে তো কথাই নেই। তখন সত্যিই নাকাল—একেবারে নাকের জলে চোখের জলে!

কিন্তু এই মেয়েটিকে দেখে আমার বোধ হোলো, সর্দির ধাত বুঝি কাটলো আমার এবার। এই আমার শেষবারের মতন সর্দি লাগা। এতদিনে আমার চিরদিনের মেয়েটিকে পেয়েছিলাম।

সর্দি শুখিয়ে হাঁপানি দাঁড়ায়, সেই শুখটানে হাঁপ ধরে শেষটায় হয়ত বা অন্তিমক্ষণ আনে। গলার ঘড়ঘড়ানি দেখা

দেয়। আর সুন্দরী হলেও সেই কাণ্ড! গলায় এসে ধরেন শেষপর্যন্ত। গললগ্না হয়ে ঘর-ঘরণী হয়ে ওঠেন!

সেই মরণদশা বুঝি বা আসন্ন, দেরি নেই আর—মেয়েটিকে দেখেই আমি টের পেলাম। নিজের উদয়ক্ষণেই আমার অস্ত যাবার গোধূলি-লগ্ন নিয়ে এলো যেন সে। এখন কৃতাঞ্জলিপুটে গললগ্নীকৃত হলেই হয়।

হায়! দেশকালপাত্রীভেদে কত দুর্যোগই না গেছে—কতো না প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ—কিন্তু এইবার খতম্! এবারই এ-হৃদয়ের চরম ক্ষত—চূড়ান্ত ক্ষতি। এই শেষ প্রাণবিয়োগ, আর নয়। এর পরে আর মৃত্যু নেই। 'মন দেয়া নোয়া অনেক করেছি মরেছি হাজার মরণে। নুপূরের মত বেজেছি চরণে চরণে।' সেই বিয়োগান্ত মহাকাব্যের এই শেষচরণ—চূড়ান্ত পাদটীকা। পরম শ্রীচরণেষু। এরপরে আর নতুন কোনো দুর্যোগ নেই কো ফের। সমস্ত দুঃখ ফেরার। সিঁড়িভাঙা আঁক শেষ হোলো; সমস্ত আঁকিঝুঁকির দেবতা, সাক্ষাৎ অঙ্কশায়িনী এলেন! এবার একান্ত নিকটযোগে—এইখানেই—হ্যাঁ, এখানেই ইতি। ইতি এবং ইত্যাদি।

এ মেয়েটি আগের মেয়েদের মতন না, প্রথমদর্শনেই টের পেলাম। এবারের ইনি আদিম না হতে পারেন, কিন্তু অকৃত্রিম বলে মনে হয়।

চাকাওয়ালা চেয়ারে এক বর্ষীয়সীকে ঠেলে নিয়ে গেটের ভেতর ঢুকলো মেয়েটি। হোটেলের এলাকায় এলো।

মাসী আর বোনঝি—দেখেই বোঝা গেল। ওরকম হিড়িম্বা কথনো এহেন বিম্বাধরার মা হতে পারে না। ব্যাধিপঙ্গু মাসীকে নিয়ে বোনঝি এসেছে হাওয়াবদলে—এছাড়া আর কী হতে পারে?

আমার ধারণা যে বেঠিক নয়, হোটেলের কেরাণীর কাছে খবর নিতেই স্পষ্ট হোলো। চেয়ারমতী বর্ষিয়সী হচ্ছেন— কাদম্বিনী ঘোষ, আর তরুণীটির নাম মীরা। মীরা মিত্র। কায়দা করে জেনে নিলাম লোকটার কাছ থেকে।

কুমারী মীরার নামের ঘোষ-না থেকেই মালুম হোলো যে তার সাথে মিত্রতা আমার অনিবার্য। অনাদিকালের থেকে অবধারিত। সম্পূর্ণ ই বিধাতার মারপ্যাঁচ—এর কোনো কাটান্ নেই। মীরার CALL এসে পেঁাছেচে আমার জীবনে, এখন মিরাক্‌ল্ ঘট্‌তেই যা দেরি।

কিন্তু দেরিতে কী দরকার? তাড়াতাড়ি আমার প্রাতরাশ সেরে নিয়ে হোটেলের লনে গিয়ে হাজির হলাম।

দেখলাম কাদম্বিনী একলা—তাঁর চাকাওয়ালা চেয়ারে। আপনমনেই গজ গজ করছেন—'ভাবলুম যে সকালেই একটু বেরুবো, তা এম্‌নি আমার পোড়া কপাল! যে লোকটা চেয়ার ঠেলতো, শুনছি সে নাকি হাজারীবাগ গেছে! মরতে গেছে আজকেই! আমার অদেষ্ট!'

আরে, এই তো মোকা—আমি দেখলাম। বরাত বুঝি খুললো আমার! সত্যি বলতে, আম্মারো তো পোড়খাওয়া কপাল—মাইনের জায়গায় মাইনাস্। অর্থের বদলে অনর্থ জোটে। এখন এই দুই মাইনাসের দ্বারা প্লাস্ করার এই সুযোগে যদি কিছু হয়!

এগিয়ে গেলাম আমি—'দেখুন, না যদি কিছু মনে করেন— যদি আমাকে দিয়ে চলে আপনার, তাহলে বলুন, কোথায় আপনি যেতে চান? আমি আপনার চেয়ার ঠেলে নিয়ে যেতে রাজি আছি।'

'তু-তুমি·· অ্যাঁ···আপনি?' কাদম্বিনী হতবাক্। হাঁ

"আজ্ঞে হ্যাঁ! ঠেলাগাড়ি ঠেলতে ভালো, খাস্তা লুচি বেলতে ভালো—কবে যেন পড়েছিলুম ছোটবেলায়!' আমি আওড়াই: 'কিন্তু পরখ করে দেখার সুযোগ হয়নি। সে সখ মেটেনিকো আমার। সেই শুভযোগ যখন হাতের নাগালে এলো তখন তাকে আর আমি হাতছাড়া করতে চাইনে।'

'আপনি আমার চেয়ার ঠেলবেন বল্‌ছেন?'

'আহ্লাদের সহিত। সকালে সামান্য কিছু খাওয়ার পর ব্যায়াম করা আমার চিরকেলে বদভ্যেস্‌। তা, আজ সেই ব্যায়ামের বদলে নাহয় আপনার চেয়ারই ঠেলা গেল। ডন্‌ বৈঠকের চেয়ে তা এমন খারাপ কি? জাতীয় ব্যায়ামই তো বলতে গেলে?'

'ব্যায়াম? তা হ্যাঁ, ব্যায়াম তো বটেই। রীতিমতই ব্যায়াম। কন্তু গির্ধারিলাল এই ব্যায়ামের জন্যে আমার কাছে আবার টাকা চায়। রীতিমতন মজুরি দিতে হয় তাকে। তা আপনি —আপনাকে কতো—কেমন—?' মজুরির কথাটা পাড়তে বোধ করি তাঁর বাধবাধ লাগে।

'না না, আমাকে আপনার কিছু দিতে হবে না। তাছাড়া, আপনি আমাকে বারবার 'আপনি' বলে কেন এমন লজ্জা দিচ্ছেন বলুন তো? আমাকে যদি পুত্রতুল্যজ্ঞান করেন তাহলেই আমি খুশি হবো।'

'বেশ তো, বেশ তো। ভালোই তো বাছা। তোমার মতো ছেলেই তো ভারতের—' সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজের প্রুফ কাটেন: 'রাঁচির মুখোজ্জ্বল। এইরকম ছেলেই তো চাই।'

তাঁর কথাশেষের আগেই তাঁকে আমি ঠেলে নিয়ে বেরিয়েছি। হোটেলে আর কেন? বাইরে—পথেই তো ভালো। হোটেলের আর পাঁচজনের সংক্রমণ-প্রবণতার মাঝখানে থাকতে

আমার সাহস হয় না। সুন্দরীরা না হয় সর্দির মতই, কিন্তু বর্ষিয়সীরাও টি-বির চেয়ে কিছু কম যায় না। ভারী ছোঁয়াচে। ছোঁ মারার দিক দিয়ে—বঁড়শীই কি আর অসিই কি—কারু চেয়েই কেউ কম নয়—কাছে গেলেই তার আঁচ পাওয়া যায়। আঁটতে যেমন কাটতেও তেম্‌নি। আমার বদলে পছন্দসই আর কাউকে বাছলেই হোলো!
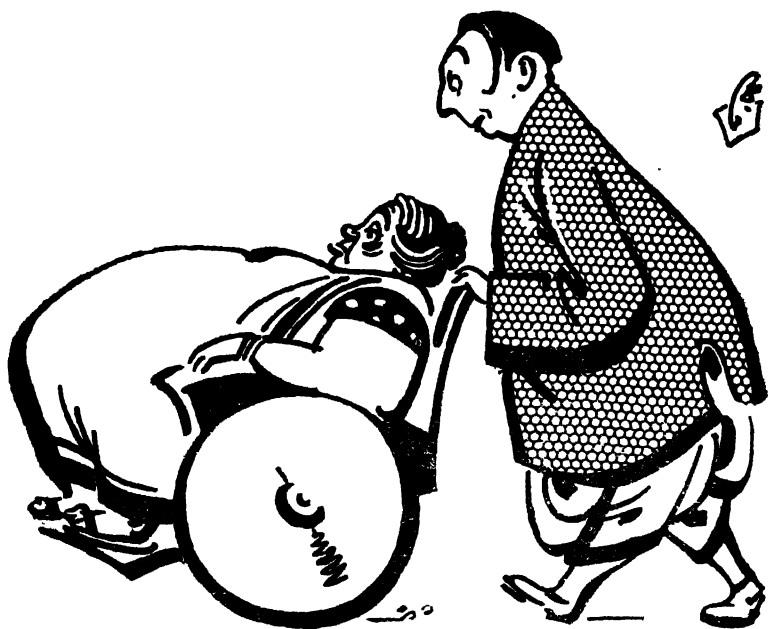
ঠেলাঠেলি করে হোটেলের এলাকার বাইরে চলে এলাম। এখন হোক্‌ না কথা—যতো কথা আর কথকতা! ঠেলতে ঠেলতেই আলাপ জমবে আমাদের, আত্মীয়তা জমাট হবে। পরের পর্যায়ে পড়ে থাকতে হবে না আমায়, পারিবারিক একজনা হয়ে উঠবো। দেখা যাবে ফিরে আসার আগেই আমি অন্তরঙ্গ হয়ে এসেছি—মীরার তীরে এসে পৌঁছেছি যখন।

মীরার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি যখন—তার প্রতিচ্ছবি খালি বুকে নয়, চোখে নিয়ে MIRROR হয়ে উঠেছি একেবারে!

মীরা হয় তো কোথাও একটু বেরিয়েছে, কিছু কেনা-কাটার কাজেই হয়তো, এই ফাঁকে—না, এ সুযোগ অবহেলার নয়, পায়ে ঠেলার না। হাতে ঠেলার। এই চেয়ার আর চক্রান্ত-বতীকে যদি আমি হাতে পাই, মুঠোর মধ্যে বাগাতে পারি যদি, তাহলে মীরা তো তখন করতলগতই আমার—এই ঠেলাগাড়ির মতই! এই চেয়ার-লক্ষ্মীর বাহন হতে পারলে, প্যাঁচা হতে পারলে, মীরা তো আপনা থেকেই আমার প্যাঁচের মধ্যে পড়বে! তখন আমায় পায় কে? মীরাকেই বা আর কে পায়? মীরার ভজনে বলেছে, বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা কিন্তু ভেবে দেখলে, আনন্দের জন্য যতই লালায়িত হও না, মীরাকে পেতেও ঠেলা অনেক।

'তুমি এখানে সবে এসেছো বুঝি?' শুধান কাদম্বিনী।

'হ্যাঁ, কাল রাত্রের গাড়িতে। উঠেছি এই হোটেলেই।'

'হাওয়া বদলাতেই আসা—না কি, আর কোনো কাজে?'

'না, কাজ আর কি! বেড়াতে—হাওয়া বদলাতে——যা বলেন!' আমি বলি, 'শুনেছি এখানে হাওয়া বদলের ফলটা নাকি খুব শীগ্গির হয়।'

'লোকে বলে বটে, কিন্তু কই বাছা, আমায় এই যে বাত—এ-বাত তো সারলো না।' তিনি দুঃখ করেন।—'কতোবার তো এখানে এলুম!'

কিন্তু আমার বাত—একেবারে আলাদা। আমি বলি আপন মনেই—আমার বেলা অন্য বাত। দ্যাখো না! রাতটা ঘুমিয়ে সকালে উঠেই দেখি—একেবারে নতুন হাওয়া! অকালবসন্ত। নাকি, অকাল-বৈশাখীই? এক রাত্তিরেই এখানকার হাওয়া

যে এতই বদ্‌লাবে—একেবারে ঝড় হয়ে দেখা দেবে আমার জীবনে—তা কি আমি কখনো ভেবেছিলাম ?

'কিন্তু একটা কথা জিগেস করি বাপু, তুমি কি কখনো কাউকে ঠেলেচো ?' তিনি জিজ্ঞেস করেন।

'কী যে বলেন! ঠেলতেই তো জীবনটা গেল।' আমি জানাই, 'লোকের ঠেলাতেই তো গেলাম!'

'ঠেলতে জানো তাহলে? ভালো, তাহলেই ভালো।' তিনি হাঁপ ছাড়েন, রাঁচির এই সব উঁচু নীচু রাস্তা– কতো চড়াই উৎরাই। এখানে ঠেলতে হলে খুব হুঁসিয়ারি লাগে। বিশেষ করে ঢালু পথে নামার সময় তো বটেই। এসবগুলো ভালো-রকম জানা আছে তো ?'

'কিচ্ছু আপনি ভাববেন না। আমি চালিয়ে যাবো ঠিক।'

'গির্ধারিলাল তো প্রাণে মেরেছিলো একবার আমায়। মোরাবাদীর মাথায় তুলে পিছলে পড়লে হঠাৎ। কলার খোসায় না কিসে পিছলে গেল কে জানে। আর আমার চেয়ার তার হাতছাড়া হয়ে চুড়ার থেকে গড়াতে গড়াতে—না বাবা, সেকথা ভাবতেও আমার বুক কাঁপে!'

'কী সর্ব্বনাশ! আঁৎকে উঠি আমিও।'

'সর্বনাশ বলে! পাহাড়ের তলায় সাঁওতালদের কি যেন পূজো হচ্ছিল। পাঁঠা বলি দিচ্ছিলো তারা। আমার এই চেয়ার পড়লো গিয়ে—মাগো মা, কী বলবো, সেই বলির পাঁঠার ওপর!'

'ঠেলা মারলো গিয়ে তাদের বলিদানে—?'

'পাঁঠা গেল ছিট্‌কে আর আমি পড়লাম সেই খাঁড়ার তলায়। মাথার ওপরে খাঁড়া এই কোপ মারে আর কি! এমন সময়ে—'

'মাকালীর দয়া!'

'মারা যান্‌নি তো তাহলে ?' আমার রুদ্ধনিশ্বাস মুক্ত করি। —'মাকালীর দয়া!'

"মাকালী না মাকাল—কোন্‌ দেবতার পূজো দিচ্ছিল তারাই জানে!'...তিনি ব্যক্ত করেন: 'সাঁওতালদের পূজো আচ্ছার কিছুই তো জানি নে বাবা তবে হ্যাঁ, তাঁর দয়া তো নিশ্চয়ই, নইলে সেযাত্রা কি আমার রক্ষে ছিলো ? গধ'রীলাল বললে, মাঈজি ভারা বচে গলেন! সেই থেকে সে খুব হুসিয়ার। হতভাগা আজ সকালে উঠেই চম্পট দিয়েছে হাজারীবাগে।'

ভালই করেছে—আমার বাগে এসেছে এই চেয়ারম্যান্‌শিপ্‌। বল্লাম জনান্তিকে। বল্লাম বটে, কিন্তু খানিকবাদেই বুঝতে পারলাম এই ঠেলা বড়ো সহজ নয়। এর ঠেলা সামলানো দায়! এ দায় ঘাড় পেতে না নিলেই বুঝি ভালো করতাম।

একটু এগিয়েই খাড়াইয়ের পথ। তারপর সে-পথ ধরে যতই এগুই, এগুতে আর পারি না। পা ধরে আসে। প্রতি পদক্ষেপে ধারণা হয় কাদম্বিনী ক্রমেই যেন ভারী হচ্ছেন। আরো ভারালো —আরো ভারিক্কি, ক্রমশই। ঠেলে তুলতে জিভ বেরিয়ে আসে। তবু প্রাণপণে চালাই, লালায়িত ভাবটা সামালাই কোনো-গতিকে—মীরার কথা মনে রেখেই। প্রতি পদক্ষেপ আমাকে মীরার মিত্রতার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে—স্মরণ করে চলি। পায়ে পায়ে ওদের পারিবারিক সীমান্তে আমার পা-কি-স্থান রচিত হচ্ছে। ঠেলাঠেলির এই চক্রান্তশেষে মাসি-বোনঝির সংক্রান্তিতে সেই রঙ্গমঞ্চে আমারও একটু ঠাঁই হচ্ছে—এই ঠেলাগাড়ির চাকার মত আমার কপালের চাকাও ঘুরছে— চক্রবর্তীত্বের পথ মুক্ত হচ্ছে আমার—মীরাদের আত্মীয়চক্রে ; এই ভেবে সান্ত্বনা পেতে চাই।

চড়াই ফুরালো মোরাবাদী পাহাড়ের চূড়ায়। শেষ হলে

আমি হাঁফ ছাড়লাম। পাহাড়ের মাথায় ছোট্ট বাড়ি, সেখানে কাদম্বিনীর কে-বন্ধু থাকে। তার সঙ্গে দেখা হওয়ার জরুরি দরকার। সেই বাড়ির দিকেই পাড়ি দেব, ঠেলবো গাড়ি, ভাবলুম একটু হাঁপ ছাড়ি—কপালের ঘাম মুছি—জিরিয়ে নিই খানিক....

হাঁফ আর হাতল এক সাথে ছেড়েচি। ব্যাস্, আর যায় কোথায়? হাতছাড়া চেয়ার তীরবেগে—তার্-বার্তার মতই—

ছুটে চললো তলার দিকে—অধঃপতনের মুখে। ভাগ্যিস, কাদম্বিনীর বরাত ভালো—এযাত্রায়ও! হৃষ্টপুষ্ট এক ভদ্রলোক উঠছিলেন পাহাড়ে। ঠেলাটা গিয়ে ঠেল্ লাগালো তাঁকে—সে ধাক্কায় তাঁর পতন হোলো। তিনি ধপাৎ হলেন বটে, কিন্তু চেয়ারটাও আট্‌কে গেল তাঁর গায়ে। তাঁর স্তূপাকারে। আর, কাদম্বিনী গিয়ে পর্যবসিত হলেন তার ওপর।

কলিশনের দিকে এগুলাম আমি আস্তে আস্তে। উৎরাইএর পথে তীরের মতন এগুনো যায় না, আমি কিছু চাকাওয়ালা চেয়ার নই, আর এই চেহারায় সেই আদর্শের অনুসরণ করতে যাওয়া আমার পক্ষে নিতান্তই গোঁয়াতুর্মি।

ধীরে সুস্থে পৌঁছে দেখি—অদ্ভুত ত্র্যহস্পর্শ! ভদ্রলোক পাত, ঠেলাগাড়ি কাৎ, আর, সেই গাড়ির গরিমা—কী—বলবো? গরিয়সী ধূলায় গড়াচ্ছেন!

মোলাকাৎ হতেই তিনি যে-ভাষায় আমাকে সম্বোধন করলেন তা খালি গির্ধারিলালই জানে। তারই শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার আগে। সে আর আমি কাউকে জানাতে চাইনে!

অম্লানবদনে সেই সব হজম করলাম। পঙ্কোদ্ধার করলাম কাদম্বিনীকে। রথচক্রের তলা থেকে রথে তোলা হোলো। আত্মদান করে অসহায়া রমণীকে উদ্ধার করার এই বীরোচিত কাজের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানালাম ভদ্রলোককে। গা ঝেড়ে উঠে জবাবে তিনি কিছু বলার আগেই, চেয়ায় নিয়ে সট্‌কালাম সেখান থেকে। ভদ্রলোকের বাক্‌স্ফূর্তি হবার আগেই আমি ফূর্তির সহিতসরে পড়েছি।

কাদম্বিনী বল্‌লেন—'বাব্বা, যা ধাক্কাটা খেলাম যে ঠ্যালাটা গেল! তোমার মতো গোঁয়ার লোক বাপু আমি জন্মে দেখিনি। ইস্, বুকটা আমার ধড়ফড় করছে। হার্টফেল না হলে বাঁচি। আমাকে বি-এন-আরের হোটেলে নিয়ে চলো; এক কাপ্ ওভাল্‌টীন না খেলে যে সাম্‌লাতে পারবো তা মনে হয় না।'

মোরাবাদীর উপত্যকা থেকে বি-এন-আর-এর অধিত্যকা—সেও একটা কম ঠ্যালা নয়। সে-ধাক্কাটা আমার ওপর দিয়েই গেল। চাকার চাকৃরিতে চৌচাকৃলা হয়ে গেলাম।

বি-এন-আর-এর রেস্তরাঁয় বসে তিনি খালি ওভ্যালটীনই খেলেন না, কেক্‌ও ওড়ালেন ডজনটাক, বিস্কুট সারলেন এক টিন্‌, কাজু-বাদাম পাঁচ প্লেট।

খাওয়া শেষে মধুর হেসে বল্‌লেন—'আমার পাস্‌'টা তো ভুলে ফেলে এসেছি হোটেলে। দামটা তুমি এখন দিয়ে দাও, পরে আমি দোবো তোমায়, কেমন?'

দশ টাকার নোট ভাঙিয়ে পাঁচ টাকা এগারো আনা দিতে হোলো। বাকী চার টাকা পাঁচ আনা তিনি আমার কাছে ধার নিলেন—রাস্তায় যেতে ফল ফুলুরি যদি কিছু দেখতে পান কিনবেন। মোট একটা দশ টাকার নোট খসে গেল।

তারপর আবার এলো ঠেলার পালা। সুদের মতন—ওষুধের মতই—চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়ে যাওয়া।

রাঁচিময় কাদম্বিনীর বন্ধুবান্ধব ছড়ানো, কিন্তু যেখানেই যাই দেখা যায় কেউ তারা বাড়ি নেই। সবাই বহির্গত। সুদূর-পরাহত কেউ কেউ। কেউ একটু আগেই বেরিয়ে গেছে, কেউ গেছে বেপাড়ায় বেড়াতে, কেউ বা বাড়িতেই থাকে না, বাইরে বাইরেই কাটায় কেউ। রাঁচি থেকেই সরে পড়েছে একেক জন। একজনা তো জানা গেল চলে গেছে করাচী। সটান্‌ পাকিস্তানেই—কাদম্বিনীর ভয়েই কিনা কে জানে!

পুনঃ পুনঃ আশাভঙ্গের ফলে কাদম্বিনী কাহিল হয়ে পড়লেন। ফের তাঁকে বি-এন-আর হোটেলে নিয়ে চাঙ্গা করতে হোলো। এবার আর শুধু কেক্‌-পেস্‌ট্রিতেই কুলোলো না। দশ টাকাতেও কূল পাওয়া গেল না। তিনি বললেন, 'বারোটা বেজে গেছে। ঘড়ি ধরে খাওয়ার অভ্যেস আমার। কখন্‌ ফিরবো হোটেলে কে জানে! খাওয়াটা সেরে নিই এখানেই—কী বলো?'

আমি আর কী বলবো? এলো ভাত রুটি, কারি-কোর্মা, চপ, কাটলেট্। পুডিং আর স্যালাড্। দই এবং সন্দেশ।

খাদ্যতালিকা দেখে লোভ লাগলো, ভাবলুম বসে পড়ি। পয়সা তো যাচ্ছে এই হতভাগারই। তিনি কিন্তু বসতে দিলেন না, বাধা দিলেন। বললেন, 'খেয়ে পেট বোঝাই করা কাজের কথা নয়। ভারী পেটে তখন ঠেলতে পারবে না। ঠেলা একটা ভালো ব্যায়াম, তা সত্যি, কিন্তু ভর্তি পেটে কোনো ব্যায়াম করা ভালো হবে কি?'

দুপুর গড়িয়ে গেছে। রাঁচীর দুপুর। পীচ্ গলতে সুরু করেছে পথের। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ। খাওয়া-দাওয়া সেরে কাদম্বিনী বললেন—'চলো, আরেকবার মোরাবাদীটা ঘুরেই যাই। তুমি তখন যা কাণ্ড করলে, বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার কথা মাথায় উঠে গেল! ভুলে গেলাম সব। চলো, এবার কিন্তু খুব

সাবধানে চালাবে, এই ভরদুপুরে ভারী পেটে যদি ডিগ্‌বাজি খেতে হয় তাহলে আর বাঁচবো না। তবে এই সময়ে—দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিশ্চয় এখন তারা বাড়িতেই রয়েছে।'

চলি। চলতে চলতে মনে হয়, দিই বুড়িকে চালিয়ে—গড়িয়ে দিই গোড়ার দিকে চূড়ার থেকে—একটা চূড়ান্ত করে ছাড়ি। আমার হাত নিস্‌পিস্‌ও করে। কিন্তু মীরার কথা মনে পড়ে। যদিও বিশ্বাস করা শক্তই, তবুও হতে পারে, মীরার হয়তো মাসী-অন্ত প্রাণ। নিজের মাসীকে প্রাণ দিয়েই ভালবাসে। তার মাসীমান্ত ঘটিয়ে কোনোদিন কি আমি তার সীমান্তে গিয়ে দাঁড়াতে পারবো? এই মুখ নিয়ে? এবং এত কাণ্ড করে—এই দুস্তর তপশ্চরণের পর—(তাপের দাপটে তো শ্রীচরণে ফোস্‌কা পড়ার যোগাড়!)—সিদ্ধিলাভের পূর্বমুহূর্তে পৌঁছে জিঘাংসার বশে সমস্ত পণ্ড করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? কাজেই সুবুদ্ধির মতই মুখ বুজে এগুই।

কিন্তু না; কাদম্বিনীর এ-বন্ধুটিও বাড়ি ছাড়া। অন্য লোককে বাড়ি ভাড়া দিয়ে উঠে গেছেন। কোথায় যেন। কে বললে যে মানুষটা পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু গেছে কোথায়? কোথায় আর? পাগলা গারদেই। আবার কোথায়? তবে একজনা বললো যে তিনি মারা গেছেন। তিনি নিজেই নাকি সেকথা জানিয়ে গেছেন! জানতে বলে গেছেন কাদম্বিনীকে।

এবার আমাদের উলটো রথ। ফেরৎ যাচ্ছি নিজেদের হোটেলে।

ফিরতি পাড়ি, কিন্তু ফুর্তি নেই। পা যেন আর চলে না, চলতে চায় না একটুও। সারা গা জড়িয়ে আসছে কেমন, ঝিম্

ঝিম্ করছে মাথা। চলেছি কোনোগতিকে। কি করে যাচ্ছি, কিসের ঠেলায়, নিজেই আমি জানিনে।

লালপুরার মোড়ে এসে পৌঁছলাম—ঠিক মরে' নয়, আধমরা হয়ে। হোটেলের টিকি দেখা গেল—দেখা দিল ক্ষীণ আশার রেখা। নাতিক্ষীণ আরেকটাও যেন চোখে পড়লো। রেখার মতই, হেঁটে চলেছে একাকী—হোটেলের কাছ বরাবর—সেই মেয়েটিই না ?

প্রায় ফার্লং দুই আগে আগেই যাচ্ছিল সে।...খুব বেশী দূরত্ব নয়।

দেখতে না দেখতে পায়ে এলো প্রাণ, গায়ে এলো জোর, প্রাণে জোয়ার—মনে জোরালো উন্মাদনা। লাফিয়ে উঠলাম আমি।

এখন একটা রামছুট্ লাগালে কেমন হয় ? যদি সেই চেষ্টায় হার্টফেল হয়ে শিবত্ব না পাই তাহলে আমার আরামত্ব মারে কে ? তাহলে হয়তো বা মেয়েটির নাগালে পৌঁছতে পারি। আমার আরামের—আমার মানসার পাশটিতে। আড়াই পা-র এক এক লাফে ঘোড়ার চাল ধরবো নাকি একবার ?

কিন্তু তার এক কিস্তি দেখাতেই কাদম্বিনী হাঁ হাঁ করে ওঠেন—'আহাহা, করো কি করো কি ! নিজের আস্তাবল দেখেই যে হন্যে হয়ে উঠলে গো ? থামো থামো। আস্তানা তো আসচেই—এত ব্যস্ত কিসের ?'

ঢিমে-তেতালায় নেমে আসতে হয়। —'না, ব্যস্ত কিছু না।'

বলেই আমি বলি ঃ 'ভাবছিলুম, একটু জোর কদমে গেলে হয়তো আপনার বোনঝিকে ধরতে পারা যেত।'

'আমার বোনঝি ? সে আবার কে গো ?' তিনি হয়ে তাকান। তাকাতেই দু' ফার্লং দূরে মীরাকে

পান।—'ও, ওই মেয়েটি? ও কি আমার বোনঝি নাকি? তুমি কি তাই মনে করছিলে বাছা?'

'আজ সকালে উনি আপনার সঙ্গে—একসঙ্গেই হোটেলে এলেন—দেখলাম না?'

'আমার সঙ্গে? হায় হায়, সকালে উঠে নিজেই গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে বেরিয়েছিলাম—একটা জরুরি চিঠি ছাড়বার ছিলো কিনা ডাকে। ফেরার পথে মেয়েটি নিজেই সখ করে আমাকে ঠেলে নিয়ে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেল। লাল-পুরার কোথায় নাকি থাকে ও। তাইতো যেন বললে। কিন্তু ওকে—ওকে তো আমি চিনিনে। কে ও?'

[দশ]

ঐ দ্যাখো ভাই চাঁদ উঠেচে

আহারে যেমন দেড়া, নিদ্রায় তেমনি দড়।

ভোজনে চ জনার্দন—শুলেই একেবারে পদ্মলাভ! তখন তাকে ঘুম থেকে তোলে কার সাধ্যি? তার ওপরে যদি বিপদ্মলাভ হবার দুর্যোগ থাকে তো সে-পথে শ্রীজনার্দন নেই। একদম্ না।

কিন্তু বিপদ তো দিনক্ষণ বেছে আসে না। দিন-দুপুরেও যেমন দেখা দেয় তেমনি রাত বিরেতেও হানা দিতে পারে।

অমিতা খানিকক্ষণ উসখুস করে' তারপরে জোড়াখাটের এধার থেকে হাত বাড়িয়ে জনার্দনকে একটু নাড়া দেয়— 'ওগো শুনচো?'

কিন্তু গভীর নাকডাকের মাঝখানে তার অস্ফুট হাঁকডাক কোথায় যে তলিয়ে যায়! 'শুনচো—ওগো?' এবারের আন্দোলনটা আরো একটু জোরালো।

জনার্দন জেগে ওঠে—'অ্যাঁ—অ্যাঁ, কী? কী হয়েছে?'

'নীচের তলায় কার যেন সাড়া পেলাম।'

'বেড়াল।'

'না না, বেড়াল নয়। কেউ যেন বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে মনে হোলো।'

'আহা, বেড়ালে যেন আর বেড়ায় না!' জনার্দন এক কথায় কথাটাকে একেবারে অকাট্য করে দেয়। তারপরে আবার তার নাক ডাকাতে থাকে।

'না গো, বেড়াল না। বলি, ঘুমুলে নাকি? ওগো—'

জনার্দনকে সজাগ হতে হয় আবার—'বলচি আমি বেড়াল। বেড়াতে ওস্তাদ বলেই ওদের ঐ নাম। তা নইলে তো লোকে তাদের গাধা কি বাঁদর বলতো। বুঝেচো? বাবা, বেড়ালের মত পাড়াবেড়ানী আছে নাকি আবার? আমরা একবার একটা বেড়ালকে থলেয় পুরে পুল পার করে দিয়ে এসেছিলাম—চুরি করে করে ভারী মাছ খেতো হতভাগা। ভাবলাম গেল বুঝি আপদ। ওমা, দেখি কী! মুখপোড়া ফের একদিন ঘুরে ফিরে হাজির! চলে এসেছে হাওড়া থেকে বেড়াতে বেড়াতে .....'

বলতে না বলতে জনার্দন কথার বেড়া ডিঙিয়ে ঘুমের ডেরায় গিয়ে পড়ে। বেড়ালটা যে শেষপর্যন্ত হাওয়া খেতে নয়, মাছ খেতেই এসেছিল সেই খবরটা আর জানানো হয় না।

'এতো ভালো জ্বালা হোলো! বেড়াল নয় গো—' অমিতা আবার তার স্বামীকে ধরে নাড়ে, 'বলছি বেড়াল নয়। বেড়ালটাকে আমি ধরে বের করে দিয়ে তারপরে দরজার খিল এঁটেছি, আমার বেশ মনে আছে।'

'তাহলে ইঁদুর। আমাদের সেই নেংটি ইঁদুর। বেড়ালটার অভাব বোধ করছে। মনের দুঃখে দাপাদাপি করছে তাই।'

'ইঁদুর? বল কিগো? অ্যাঁ? ইঁদুর বেড়ালের জন্যে—?' অমিতা অন্ধকারে নিজের গালে হাত দিলেও তা দেখা যায় না।

'করবে না? ইঁদুরদের কি বিরহ হয় না? হতে নেই কি? খালি কি তোমার আমারই শুধু হয় নাকি?' বলে' জনার্দন ফের পাশ ফেরে।

'কী বিপদেই পড়লুম! বেড়াল নয়, ইঁদুর নয়, কার যেন পায়ের আওয়াজ! পায়ের আওয়াজই নয় খালি, গলার আওয়াজও পেলাম যেন। মানুষের গলার।'

'একটু যে চোখের পাতা বুজবো তার যো নেই!' জনার্দনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে—'আচ্ছা, দেখচি আমি। নাচে গিয়ে দেখে আসচি।'

'খুব সাবধান কিন্তু। ওদের হাতে ছোরাছুরি থাকে'—অমিতা সতর্ক করে।

'সে আর তোমায় বলতে হবে না!'

শীতের রাত্তির। লেপের প্রলেপ ফেলে উঠতে হয় জনার্দনকে। জানালা খড়খড়ি এঁটে-বন্ধ-করা—ঘরে ঘুটঘুটি আঁধার। সে-আঁধারে চোখে পড়ে না কিছুই, তবে একজনের ওঠাবসার খস্‌খসানি শোনা যায়। সেই নড়া-চড়ার মধ্যেই একটা কথা নাড়াচাড়া দেয় জনার্দনের মনে—

'তুমি ঠিক জানো মানুষের গলা? শুনেচো ঠিক? অ্যাঁ? আমার এই নাকের ডাক নয় তো? নাকের আওয়াজকে মানুষের গলা বলে ভ্রম করোনি তো? ইস্‌, এই নাকটাকে নিয়ে যে কী বিপদেই পড়া গেছে! এর জন্যেই যতো হ্যাঙ্গাম্‌! একটু যে নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমুবো তার যো নেই। এই ব্যাটাই আমায় ডোবাবে দেখচি।'

হাহুতাশ করে জনার্দন। বাস্তবিক, তার এই নাকের জন্যেই যতো না নাকাল! ঘরের মধ্যে যদি জাঁতার মত সারারাত ঘর্ঘর চলে তাহলে সেই অনুনাসিক যাতনায় কারো ঘুম হয়? তার বৌয়ের যে হয় না সে আর বেশি কি? আর রাতভোর জাগতে হয় বলেই তাকে চোর-ছ্যাঁচোড়ের পদধ্বনি শুনতে হয়। কান পেতে থাকে বলেই এক তিল আওয়াজকে এক তাল বলে মনে করে। নাঃ, নাকের এই ন্যাকামো বন্ধ না করলেই নয়·· ···

খাটটা ক্যাঁচ-কোঁচ করে। জনার্দন উঠেছে তাহলে! চৌকি ছেড়েচে—চৌকিদারি করতে। অন্ধকারে চোখ চলে না বটে

তবে যতটা ঠাওরানো যায়—অমিতা কল্পনানেত্রে ছাখে, তার স্বামী— অমিতবিক্রমে ঘুমে—ঢুলতে ঢুলতে আগুয়ান হয়েছে।

'ই স, কী ঠাণ্ডা!' না, নাক নয় এবার, জনার্দনের অর্দ্ধস্ফুট স্বর—তাদের ড্রেসিং টেবিলটার কোণ থেকে কানে আসে অমিতার।

'খুব সাবধান কিন্তু—' আবার সে মনে করিয়ে দেয়।

কিন্তু আর কোনো প্রতিধ্বনি আসে না। আর কোনো সাড়া নেই জনার্দনের—টুঁ-শব্দটিও নেই আর। প্রেতের মতই নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে বেরিয়ে গেছে—অভিপ্রেত যাত্রায়।

সিঁড়ি ধরে নামছে জনার্দন, মনশ্চক্ষে ছাখে অমিতা। সিঁড়ির কোণে-রাখা মোটা লাঠিটা সে বাগিয়ে নিয়েছে······লাঠি হাতে আগিয়ে চলেচে ধীরে···ধীরে······

একটু ভয় খায় অমিতা, সত্যিই। জনার্দনের ক্ষমতায় তার সন্দেহ নেই—গায়ের জোর আছে ওর। চোর যদি লাঠির সামনে পড়ে তাহলে তার বাঁচন নেই। তা ঠিক। কিন্তু যদি সামনে না পড়ে পিছনে পড়ে? পেছন থেকে যদি—? ছোরা-ছুরি না নিয়ে তারা বেরোয় না আবার!

ধুক পুক করে অমিতার বুক। কই, লাঠালাঠির কোনো আওয়াজ তো আসছে না। হাঁটাহাঁটিরও নয়। টিকৃটিকির ডাকটিও শোনা যায় না। যে-টিক্‌টিক্ ধ্বনি কানে আসে তা ঘরের কোণের সডাক ঘড়ির।

তাহলে—তাহলে জনার্দন কি তবে লাঠিগ্রস্ত—ধরাশায়ী? ছুরিকাবিদ্ধ রক্তাপ্লুত— ভূলুণ্ঠিতই? হতাহতের কোনো একটা? তা যদি না হয়, তবে কোনো সাড়াশব্দ নেই কেন তার?

নাঃ, আর থাকা গেল না। আস্তে আস্তে বিছানা ছাড়লো অমিতা। ছেড়ে উঠলো রাগ্-এর অনুরাগ। নিজের স্লিপারের ভেতরে পা গলালো। আলোয়ানটা জড়িয়ে নিলো গায়।

কিন্তু আলো জ্বাললো না, পাছে চোরটা টের পেয়ে যায় তাদের সজাগ লীলা। নিঃশব্দে দরজা খুলে সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়ালো সে।

অন্ধকার ঘুট্‌ঘুট্টি। তবুও, আলো জ্বালবার তার দরকার নেই একটুও। এ-বাড়ির অলিগলি, ঘরদোর, নীচ-ওপর, সিঁড়ির প্রত্যেকটি ধাপ তার মুখস্ত। কোথায় কী আছে না-আছে সব তার নখদর্পণে। এবিষয়ে হাতের মতই পায়ের নখের সমদর্প।

পা টিপে টিপে নামে অমিতা। চারধার চুপ্‌চাপ্‌। কোনো আওয়াজ নেই কোথ্‌থাও। কেবল বাসন ধোয়ার ঘোলাটে কল থেকে জল পড়ছে টিপ্‌ টিপ্‌ করে। কলের মুখটা ভালো করে এঁটে যায়নি ঝি।

জলের টিপ্ টিপের সঙ্গে তাল রেখে পা টিপে চলে অমিতা। রান্না ঘরে সেঁধোয়। অন্ধকার। শুধু উনুনের পড়ন্ত আঁচটুকুই যা একটু ছটা ছড়াচ্ছিল।—হতভাগা ঝিটার কাজের ছিরি জানাতেই। উনুনের আধপোড়া কয়লাগুলোও নামিয়ে যেতে পারেনি মুখপুড়ী।

উনুনের আঁচ পেলো কিন্তু চোরের কোনো আঁচ পাওয়া গেল না। জনার্দনেরো নয়। ছদুটো লোক গেল কোথায়?

চোর না হয় চুলোয় যায়, কিন্তু তার আপন জন—? তার এহেন চোরের মতন ঘাপ্ টি মেরে থাকা—এমন বেঢপ্ আচরণের মানে?

নাঃ, কোনো সাড়া নেই জনার্দনের। আঁচড়টিও না। অস্ফুট একটু কাতরোক্তিও নেই। হতাহত হয়ে থাকলেও একটা অধঃপতিত দেহ—পতিদেহই—অন্ধকারে তার পাদস্পর্শ লাভ করতো। কিন্তু কই, হাতড়ে পাতড়ে কারোই তো পাত্তা মিলছে না।

আলো নেই এক ফোঁটাও। খাবার ঘরটার এক কোণে রাস্তার গ্যাসবাতির সরু এক ফালি আলো এসে পড়েছে, অন্ধকার একটু ফিকে সেদিকে। 'কোথায় গা তুমি?' ফিস্ ফিস্ করে সে—'শুনতে পাচ্চো ডাকচি?'

উচ্চৈস্বরে যতোটা ফিস্ফিস্ করা যায়—ফিস্ ফিস্ করে যতোটা স্বর উঁচানো সম্ভব—সে করে; কিন্তু জনার্দন নিজেকে ফাঁস করে না। ফেরত ডাকের কোনো জবাব নেই সে-দিক থেকে।

অমিতার বুক গুড় গুড় করে। সে আর স্থির থাকতে পারে না। খাবার ঘরের সুইচ টিপে আলোটা জ্বালে—বীভৎসতম দৃশ্য দেখে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বার আশঙ্কা নিয়েই—তৈরি হয়েই।

কিন্তু না, চিরপরিচিত আসবাবপত্র ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না। না চোর, না জনার্দন—। দুজনেই লোপাট্ !

'হ্যাগা, কোথায় তুমি ?' এবার গলা বড়ো করে অমিতা—'গেলে কোথায় গো ?'

কিন্তু জনার্দন নিঃশব্দ, নির্জন। একেবারে কোনো রা নেই তার। তারা ! কী সর্বনাশ হয়েছে কে জানে ! ভয় খেলেও, অমিতা আগায়। অকুস্থলে এগুতে দ্বিধা করে না। এ ঘর থেকে ও ঘরে যায়, আলো জ্বালে, চারধার ছাখে ভালো করে, কিন্তু কই, কোথাও কোনো তছনচ ঘটেনি তো। জিনিষপত্র—যেখানকার যা সেখানেই আছে। কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি হয়নি। ভালো করে খুঁটিয়েও ইতরবিশেষ কিছু তার চোখে পড়লো না। বিশেষ-ইতর সেই চোরের চেহারাও যেমন দেখা গেল না, ভদ্র শ্রীজনার্দনও তেম্নি নিশ্চিহ্ন ! বেয়াড়া ব্যাপার !

কোথাও সিঁধকাটা হয়নি, কোনো সিঁধকাটিও নেই। সার্সি-খড়খড়ি ঠিকঠাক। জানালা-দরজাও ভাঙেনি—যেমনকার তেম্নি লাগানো, খিল্-আঁটা ভেতর থেকে। যেমনটি সে রেখে গেছে, দেখে গেছে শুতে যাবার আগে। চোর তাহলে ঢুকলো কোথা দিয়ে ? চোর যদি না এসে থাকে নাই আসুক্, না এলো তো বয়েই গেল, কিন্তু জনার্দনই বা নেই কেন ? কোথায় গেল বেমালুম ?

নেমে এলো যে জনার্দন, গেল কোথায় সে ? যদি তাকে মুখ বেঁধে গুম্ করে থাকে, তাহলেও কি সে একটু গুম্রাবে না ? মৌখিক বাধ্যতার আগেও অন্ততঃ ? আর যদি তাকে এখান থেকে সরিয়েই নিয়ে যায় তাহলেও তো সদর দরজাটা খোলা থাকবে। চোর কিছু তাকে নিয়ে উবে যেতে পারে না। তবে ?

অমিতা দরজা খুলে উঁকি মারলো বাইরে। তাকালো এগিয়ে গলিটার এমোড় থেকে ওমোড় অব্দি। একটা পাহারোলাকে আসতে দেখলো আস্তে আস্তে। দেখে আশ্বস্ত হোলো একটু।

'কেয়া মাইজি? কোই, কুছ গড়বড় হুয়া?' পাহারোলাটা জিজ্ঞেস করে।

'হাঁ জি! হামকো কর্তাকে দেখতে পাচ্ছিনে।' বলে সমস্ত ব্যাপারটা বিশদরূপে সে বোঝালো—হিন্দিতে বাংলায় মিশিয়ে। ছাতুর বিলাস আর বাংলার ব্যাসন—বিলাস-ব্যসন এক করে।

'আচ্ছা, হামি দেখছে—।' বলে পাহারোলা খোঁজ নিতে আগালো—'আপ্ ঘাবড়াইয়ে মাৎ।'

নীচেকার ঘরগুলো ফিরে দেখা হোলো আবার—বেশ তন্নতন্ন করেই। আনাচে কানাচে, এধারে ওধারে। কয়লাঘরে—ময়লাঘরে। কলতলা, ধকলতলা—বাদ গেল না কোথাও।

পাহারোলা সিঁড়ি ধরে দোতলার দিকে এগুলো তারপর।

'ওপরে আসেননি উনি।' অমিতা জানায়—'সেকথা আমি জোর করে বলতে পা র, পাহারোলাজি, তাঁর নামার পরেই তো আমি নামলাম।'

'তব্ ভি একদফে দেখ্না দরকার। হামার তো ভারী তাজ্জব লাগছে মাইজি! কেয়াঁরি ভিতর্সে বন্. কাঁহা যা সাক্তা বাবুসাব্ ?'

শোবার ঘরের সুইচ টিপতেই জনার্দন ধড়মড় করে ওঠে। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে বিছানায়।

'একি! তুমি এখানে?' অমিতার কথা বেরয় না—'এম্নি করে বিছানায় শুয়ে—?'

পাহারোলা আর দাঁড়ায় না তারপর। পা বাড়ায়।

কিন্তু জনার্দনের কৈফিয়ৎ বেরয়—'ওঃ, ভুলে গেছি। ভুলে গেছি বেবাক্। নীচে গিয়ে দেখবার কথাটা মনেই ছিল না। ইস্, ছি ছি! ফের আবার কখন ঘুমিয়ে পড়লুম ? অ্যাঁ ?'

জিজ্ঞাসু নেত্রে স্ত্রীর কাছেই সে যেন সদুত্তর চায়।

'তুমি যে উঠলে গো। বিছানা ছাড়বার খস্খসানি শুনলুম্—আমার ড্রেসিং টেবিলের কাছেও খুট্খাট্ শোনা গেল যে!'

খাটের ক্যাঁচকোচও শুনেছে - সেকথাও বুঝি বলতে যাচ্ছিল অমিতা, কিন্তু এসব কচকচি জনার্দনের কাছে বাহুল্য বোধ হয়। এক কথায় সে সব কথা পরিষ্কার করে—

'ও, তোমার ড্রেসিং টেবিলের কাছটায়—হ্যাঁ, গেছলাম

বটে একবার। আমিই গেছলাম! তোমার গন্ধ তেলের থেকে একটু নিয়ে এই পোড়া নাকে লাগালাম। পাজি নাকটাকে

বাগালাম আগে। ভারী ঘুমের ব্যাঘাত করে এ-ব্যাটা— তোমারো—আমারো। তারপর নাকে তেল দিয়ে—'

তারপর আর বলতে হয় না জনার্দনকে। না বললেও চলে।

[এগার]

ওল খেয়োনা ধরবে গলা

একটু আগেই ফোন্ এসেছিল—অনিমার ছোটো বোন শোনিমা—না, শোনিমা নয়, তার দু বছরের খুকী তনিমা আধ-খানা টিক্‌টিকি গিলে নীল হয়ে গেছে—

খবরটা শুনেই প্রাণকেষ্ট বললো—'টিক্‌লে হয়।' তাকে বেশ একটু ভাবিতই দেখা গেল যেন।

'কেন, টিক্‌টিকি গিললে বুঝি বাঁচেনা ?'

বোনঝির দুশ্চিন্তায় অনিমা নীল হয়ে যায় নিজেই।

'টিক্‌টিকিটার কথাই বলছিলাম।' ভাষ্য করেছেন টীকাকার।—'বাঁচবে কিনা সন্দেহ।'

'দেখতে হোলো মেয়েটাকে একবার। চল্লাম আমি। কাঞ্জিলালবাবু আসবেন জামা-কাপড়ের মাপ নিতে। বলা রয়েছে তাঁকে। এক্ষুনিই – এই সকালেই আসবার কথা। এলে তোমার গায়ের মাপটাপ দিয়ো—মাথা খাটিয়ে দেবে, বুঝলে? যাতে তিনি কাপড় চুরি করায় তাল না পান। আমার একটা ব্লাউজও দেবে, বুঝেচো? ছেঁড়া ব্লাউজটা। মনে থাকবে তো?'

প্রাণকেষ্টর মননশীলতায় অনুর এক ফোঁটাও আস্থা নেই, তাই বার বার মনে করিয়ে দিতে হয়। এবং তার নিজের প্রতি নিজের আস্থাও ঐ অণুমাত্রাই, তাই এই সনির্বন্ধ অনুরোধ অনিচ্ছাসত্বে ঠেলে গুরুতর কর্তব্যচ্যুতির দায়ে পড়ে, পড়ে পাছে পারিবারিক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় সেই ভয়ে প্রাণকেষ্টকে তটস্থ থাকতে হয়। কখন তার দরজার কড়া নড়ে—কাঞ্জিলালবাবুর নাড়া আসে, সাড়া আসে—দয়া করে তিনি দেখা দেন—সেই আশায় সে উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

অনিমার অন্তর্ধানের একটু পরেই কড়া আওয়াজটা আসে। কড়ারমতই আসে; আর, কানে আসতেই সে দৌড়ে যায় দোর-গোড়ায়। দরজাটা খোলে।

কিন্তু দরজাটা খুলেই সে দাঁড়িয়ে গেছে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন। ভাগ্যিস, কড়াটা ছিলো! সেইটেকেই হাতলের মত পাকড়ে নিজেকে সামলেছে সে কোনোরকমে।

ঊনবিংশ শতকের পোষাকদুরস্ত (এবং নিজেও উক্ত শতাব্দীর) কাঞ্জিলালের বদলে দেখা দিয়েছে বিংশ শতাব্দীর এক আধুনিকা—যাকে কিছুতেই বিংশতির বেশি বলে বোধ হয় না। দর্জায় দর্জির স্থলে গোলাপী সোয়েটার-আঁটা মেয়েটিকে দেখে কাঞ্জিলালের-সঙ্গে-জড়িত অব্যবহিত কাজের কথাটা ভুলে

যায় সে। তার হাতের তলায় হাতল কাঁপতে থাকে–টরে টক্কার মতই! সেই তার-স্বরে কাঁপন তোলে তার মনে।

মেয়েটিই বুঝি ভুলিয়ে দেয়। মোলায়েম হেসে সে বলে— 'বাবা এই তল্লাটেই আছেন। আমাকে আসতে বল্লেন এই বাড়িতে। আমাদের কলেজের ছুটি কিনা আজ! তাই বাবাকে আমি একটু সাহায্য করছি—তাঁর কিছু কিছু কাজ করে দিচ্ছি '

কাজের কথায় কাঞ্জিলালের কথা তার মনে পড়ে। কিন্তু এমন মেয়ের দিকে চেয়ে জামার মাপ দেয়ার কথা কি করে ভাবা যায়? গায়ে-আঁটো সোয়েটারের ওপরে নজর পড়তেই সব কথা তার হারিয়ে যায়—সমস্ত ভাবনা গায়েব্ হয়। এই অভাবনীয়ার হাতে আত্মসমর্পণ করে' নিজের দেহের মাপ দেবার কথা সে ভাবতেই পারে না।

'বাবা এসে পড়বেন এক্ষুনি।' মেয়েটি জানায়।

'তুমি তাহলে ভেতরে এসে বসো নাহয়?' একটু আমতা আমতা করেই সে আমন্ত্রণটা করে—'তাঁর না আসা পর্যন্ত ততক্ষণ—কেমন?'

মেয়েটি ভেতরে আসে। প্রাণকেষ্টর মনে হয় যে-মাপের সোয়েটার তার ঠিক খাপ খায় তার চাইতে ৬ সাইজের কম জামাই যেন সে গায়ে চড়িয়ে এসেছে। সোয়েটারের সেই চূড়ান্ত পরিণতির দিকে তাকানো যায় না।

অপরিচিতার সাথে আলাপবচনে কি করে এগুবে প্রাণকেষ্টর এখন সেই সমস্যা, কিন্তু মেয়েটি নিজেই যেন সমাধান করে। তাকের ওপর থাকে থাকে পেয়ালা-পিরিচগুলি দেখে সে উস্‌কে ওঠে—'বাঃ, বেশ চমৎকার তো কাপ্‌গুলি। দু কাপ্ ওভ্যালটিন্ বানানো যাক্। কী বলেন?'

বলে প্রাণকেষ্টর বলার অপেক্ষা না রেখেই সে টেবিলের

ধারে এগিয়ে হীটারটিকে জ্বালায়, জমাট দুধের টিন পাড়ে, চিনির বোতল নামায়। জলের কেট্‌লি হীটারের ঘাড়ে চাপিয়ে ওভ্যালটিনের কৌটোর দিকে হাত বাড়াতেই প্রাণেকেষ্ট মৃদু-স্বরে আপত্তি তোলে একটু—'তোমার বাবা এলে পরে তখন করলে হোতো না?'—বলতে যায় সে—'একেবারে তিন কাপ্ বানানো যেত একসঙ্গে?'

'আবার করা যাবে নাহয়। করতে কতোক্ষণ?' জবাব দিয়েছে মেয়েটিঃ 'হীটার আছে, দুধ আছে—চিনি, ওভ্যালটিন সবই তো মজুদ্। সমস্তই রয়েছে দেখছি।'

তা আছে বটে। কিন্তু সেই সঙ্গে অনিমাও রয়েছে। বোন্‌ঝির তদ্বির সেরে কখন এসে পড়ে ঠিক নেই—শোনিমাদের বাড়ি বেশি দূরে তো নয়। শোনালেই রক্ষে ছিলনা, তার ওপরে এসে যদি নিজের চোখে দ্যাখে, ওভ্যালটিনের এই অপচয়—দুর্মূল্য দুধ চিনি দিয়ে এই পরিচর্যা—পরের মেয়ের পরিতুষ্টি—মোটেই সে ভালো চোখে দেখবে না। অপরিচিতাদের ওপর এমনিতেই তার বিষনজর—কেন কে জানে—বিশেষ করে প্রাণকেষ্টর সঙ্গে যদি তাদের বিজড়িত দ্যাখে…তার ওপরে এমন আঁটসাঁট-সোয়েটারওয়ালীর প্রতি তার এই আঁটি-সুঁটি যদি সে এসে দেখতে পায় তাহলে—না, প্রাণকেষ্ট সেকথা ভাবতেই পারে না। ভাবতে প্রাণে কষ্ট পায়। তার বুকের ভেতরটা কিরকম করে! মেয়েটিকে দেখে মনের মধ্যে যে স্পন্দন জেগেছিল তাই বুঝি তার হৃৎপঞ্জরে গড়ায়। বুক ধড়ফড় করে।

'তাহলেও তিনি আসুন না! এই তল্লাটেই আছেন বলচো তো, এসে পড়লেন বলে।' বলে প্রাণকেষ্ট আশা করে—তিনি আসার আগে তার নিজস্ব-তিনি এসে পড়বেন। এসে পড়ে

সব দিক বাঁচাবেন—তার দিক, তাঁর নিজের দিক, এমনকি, ঐ ওভ্যালটিনের দিকটাও।

'বাবার জন্য আপনি ভাববেন না। ওভ্যালটিন তাঁর সয় না, তিনি বলেন ও খেলে তাঁর গলা বুজে আসে, বক্তৃতার ভারী অসুবিধা হয় তাতে।'

কাঞ্জিলালের কাজ তো গায়ের মাপ নিয়ে বেড়ানো—

বক্তৃতার স্থান তার কোন্ জায়গায় সে ভেবে পায় না। দর্জির কল ঠিক না চালালেও দর্জির কারখানা তিনি চালান্। তাঁর নিজের কারখানা। কিন্তু দর্জিদের কাজ তো মর্জিমাফিক্, বক্তৃতার মধুর সুরে কিংবা উদাত্ত স্বরে প্রেরণা দিলে কতোখানি সুরাহা হয়—তাদের হাত পা—মানে, তাদের কল-কবলিত জামা-পায়জামার হাত পা কদ্দূর এগোয় সেটা ভাববার কথাই।

প্রাণকেষ্ট ভাবে। কিন্তু মেয়েরা কখনো অভাবে থাকতে পারে না। সে এদিকে গ্রামোফোন খুলে দিয়েছে—

'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনায়··· ভুলো না···ভুলো না—আ—আ !···

প্রাণকেষ্ট নিজের চিন্তাসূত্রে ধরে ঝুলছিল। সঙ্গীতের সূত্রপাতে তা ছিন্নভিন্ন হয়।

তপ্ত ওভ্যালটিন্ পেয়ালায় পড়ে। মেয়েটি প্রাণকেষ্টর হাতে তুলে দেয়, নিজের মুখে তোলে।

তিন চুমুক খাবার পর চম্‌কে ওঠে প্রাণকেষ্ট—তরল পানীয় হঠাৎ যেন জমে তার গলায় গিয়ে আট্‌কায়—অনিমাকে দেখা যায় আসতে। এই জমাটির মুখে, যমের মতই আসন্ন।

'কেমন দেখলে তনুকে ?' ঢোঁক গিলে সে বলে।

'ভালোই।' জবাব দেয় অনিমা—একটু ভুরু কুঁচকেই বুঝি : 'আস্ত একটা টিকটিকি গিলে চোখ মুখ কপালে উঠে গেছল। তারপরে বমি করে ফেলতেই সেটা বেরিয়ে গেছে। মুখ চোখ ফের আবার বসে গেছে—যেখানে যেমনটি ছিলো। যাক্, এদিকে···তোমার কদ্দূর ?'

তনুর কথার পরে তন্বীর কথায় আসতে চায় অনু কি ? যুতসই কোনো জবাব দিতে পারে না প্রাণ। ওভ্যালটিন যে বলৎশক্তি হ্রাস করে হাতে হাতে তার প্রমাণ পায়।

'আসবার পথে কাঞ্জিলালবাবুকে দেখলাম।' অনিমা প্রকাশ করে।—'আরেকটা বাড়িতে যাচ্ছেন বল্লেন।'

'ও, হ্যাঁ। কাঞ্জিলালবাবু। জামার মাপের জন্যে আসবার কথা ছিল বটে।' প্রাণকেষ্টর মনে পড়ে তখন।

'বল্লেন যে এখানে এসে ডেকে ডেকে হদ্দ হয়ে গেছেন! দরজার কড়া নেড়ে নেড়ে হাত ব্যথা করে ফেললেন। সাড়া পাননি কারুর।'

বটে? তিনি এসেছিলেন তবে? কিন্তু তেমন তেমন কড়া আওয়াজও তার কানে এলো না, কানের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে মর্মভেদী হোলো না—এই বা কেমন? অবশ্যি, এধারে মিনতিমাখা সুরে না ভোলার একটা আবেদন বাজছিল বটে, গানের সাড়ার সঙ্গে প্রাণের ইসারা মিলে তার মনের পারাবার তোলপাড় করছিল—তাও ঠিক, কিন্তু এমন গীতি-নাট্যের মাঝখানেও কড়া তলব এলে সে টের পাবে না—অমন কড়াকড়ির কথাটা ভুলে যাবে, এ কি কখনো হতে পারে?

জীবনের নানাবিধ রহস্যের মতই এও বুঝি আরেকটা? রহস্যভেদে অপারগ প্রাণকেষ্ট অন্যকথা পাড়ে—নিজের এবং পরের কপিরাইট্—দুই পরির মধ্যে পরিচয়-স্থাপনা করতে যায়—'আমার বৌ, শ্রীমতী কাঞ্জিলাল—'

মিহিসুরে সে আওড়ায়।

শ্রীময়ী কুমারীকে 'শ্রীমতী' বলে পাচার করে অনিমার বিশ্রী মতির আঁচ থেকে যদি বা বাঁচা যায়! মেয়েটার বাঁকা সিঁথির মাঝে কোথাও সিঁদুর রেখা আঁকা আছে কিনা তা কি তার বৌ তাকিয়ে দেখবে? দেখতে যাবে ভালো করে—এই রাগের মাথায়? দুই (ফি) মেল-গাড়ির ঠোকাঠুকি লাগার আগেই লাল নিশান দেখিয়ে কলিশান্ রোকা যায় যদি!

'বস্থন শ্রীমতী কাঞ্জিলাল। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বস্থন।' মেয়েটি অমায়িক হয়ে ওঠেঃ 'ভারী খুশি হলুম আপনাকে দেখে। দাঁড়ান, আপনাকে এক পেয়ালা ওভ্যাল্‌টিন বানিয়ে দি।' হাসিহাসি-মুখে সে কেটলির থেকে গরম জল ঢালে—'তবে কিছু মনে করবেন না। সত্যি সত্যি আমি ওঁর বৌ নই। উনি আপনার সঙ্গে ইয়ার্কি করছেন।'

অনুর ভ্রূকুটিল কপালের ঈশান কোণে যে কালোমেঘের ছায়া দেখা গেছল সেই মেঘলা এখন তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। মুখর সেই ঘনঘটায় খালি চোখালো বিদ্যুৎই না, সেই সঙ্গে প্রাণকেষ্টর পিলেও বুঝি চম্‌কাতে থাকে।

'আহা, একটু ভুল হচ্ছে তোমাদের',—প্রাণকেষ্ট অনেক লেখকের মত প্রুফের ওপর ইম্‌প্রুভ্‌ করতে যায়—'ইনি—ইনিই আমার স্ত্রী। আর—' মেয়েটির দিকে তাকিয়ে—'আর তুমি—তুমি তো ভালোই জানো যে কাঞ্জিলালবাবুর মেয়ে তুমি।'

'মোটেই আমি কোনো কাঞ্জিলালের মেয়ে নই।' চোট্‌-পাট্‌ জবাব আসে শ্রীময়ীর—'আমি কুমারী শর্মিলা সেন। শ্রীযুত বিরূপাক্ষ সেন আমার বাবা। কাঞ্জিলাল ফাঞ্জিলাল আনবেন না আমাদের মধ্যে। এই পল্লীর থেকে আমার বাবা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন—জানেন না? আমি তাঁকে সাহায্য করছি—এইমাত্র। তাঁর হয়ে ক্যান্‌ভ্যাস্‌ করছি এসে।'

'অ্যাঁ?'—আরেকখানা ক্যানভ্যাস বুঝি প্রাণকেষ্টর মুখপটে বিস্তৃত হয়। শাদাটে ক্যান্‌ভাস্‌।

'হ্যাঁ। বাবাও বেরিয়েছেন ক্যানভাসিংয়ে—এই পাড়াতেই। আমাকে বল্লেন আটাশ নম্বর বাড়িতে আসতে। বল্লেন যা, সেখানে তোকে খুব আদর যত্ন করবে।'

'তাহলে তাও বলি বাপু, সাতাশ নম্বর বাড়িতে যতটা আদর পেয়েছো ততটা তুমি সেখানে পাবেনা। এ আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি।' অনিমা বলে—মেয়েটিয় দিকে তীর্যক আর প্রাণকেষ্টর দিকে তীরবৎ দৃষ্টি হেনে।

'আটাশের বাড়ি? আহা, সে-বাড়ি যে আমাদের ঠিক পাশেই গো!' প্রাণকেষ্ট এগিয়ে আসে –'আগে বলতে হয়। চলো, তোমাকে আমি দেখিয়ে দিগে বাড়িটা।'

মেয়েটিকে নিয়ে সে এগোয়।

'একটু চট্‌পট্‌ যাও বাছা। এখানে তো ওভ্যালটিন ধ্বসিয়েছো' অনিমা পেছন থেকে চেঁচায়—'ওখানকার কেক বিস্কুট ফুরোবার আগে যদি যেতে পারো—তবেই ভালো।'

'না, সে ভয় তোমার নেই।' যেতে যেতে প্রাণকেষ্ট জানায়—'বিস্কুটের ওদের কারখানা। খাসা বিস্কুট—নামজাদা বিস্কুট সব। তোমার বাবা বলেছেন ঠিকই।' কুমারীর কানের কাছে সে ফিস্‌ফিস্‌ করে। অনিমার কটুকণ্ঠের বিষভাগ যতখানি বিস্কুটের পালিশ দিয়ে ঢাকা যায় সেই চেষ্টাই ওর।

দরজার কাছে গিয়ে মেয়েটি ফিরে দাঁড়ায়। ক্যানভাসের ওপরে তুলি বোলানোর মতই মোলায়েম আঁচড় কাটেঃ 'তাহলে আপনার দশা এখন কী হবে মশাই?'

'সে আমি ম্যানেজ্‌ করবো।' মেয়েটির চোখের ওপর ওর চোখ পড়ে। ফের ওর হাতের কাঁপুনি দরজার কড়ায় কাঁপন তোলে—টরেটক্কার-সুর বাজায়। ওর হৃৎপিণ্ডের তালে তালেই।

—'তবে তোমরা যদি সত্যি সত্যি আমার ভোট চাও তাহলে আমার জন্যে একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ো। নইলে—খুব সম্ভব—আমি হয়ত যেতে পারবো না।'

প্রাণের টান আর প্রাণ নিয়ে টানাটানি—দুয়ের দ্বন্দ্বসমাসের মধ্যে পড়ে আরেক প্রাণান্তকর পর্বের জন্যে সে প্রস্তুত হয়।

'ভাববেন না একটুও। সেই অ্যাম্বুলেন্সে নার্স হয়ে আমি আসবো—আপনার জন্যে। আসবো ঠিক, দেখবেন আপনি।'

[বার]

ঔষধ খেতে মিছে বলা

শীস্ দিতে দিতে এগুলাম আমি—তিনতলার দিকে। একেক লাফে তিনটে করে সিঁড়ি টপ্‌কালে টপ্ করেই পৌঁছোনো যায়। সব্বের ওপরের ফ্ল্যাট্‌ই—আমার শীসমহল!

এতদিন পরে এতদিন ধরে—দিনের পর দিন ধরাধরির পর—একটা দিনের মতন দিন আজ!

ঘন্টিকল টিপতেই বেবি বেরিয়ে এলো।—'মীরা?'

'আছে দিদি।' সহাস্যে জানালো সে: 'চিঠি পেয়েছে আপনার।'

বেবির হাসিটা শুভলক্ষণ। হয়তো এতদিন পরে আমার জীবনে একটা মিরাক্‌ল্—ঘটতেও পারে। যদি ঘটে তাহলে

বেবিকে—বেবির হাসিহাসি মুখ যাতে বেশ খুসিখুসি হয়ে ওঠে এমন কিছু ওকে······

বেবি, মীরার ঘরে নয়, তার নিজের পড়ার ঘরে নিয়ে বসালো আমায়। সঙ্গে সঙ্গেই মীরা এলো।

'তোমার চিঠি পেয়েছি।' মীরার গলায় সুরের মীড়।

'লক্ষ্মিটি! তুমি রাজি তো তাহলে?'

'এক মিনিট।···বেবি, যাও তো। বিরূপাক্ষবাবু ও-ঘরে আছেন, তাঁকে এখানে আসতে বলো।'

বেবির একটু পরেই দরোজা ঠেলে এলেন এক ভদ্রলোক।

আমার মাথা ঘুরে গেল। সুরের মূর্ছনার মাঝখানে অসুরের উপদ্রবে কে না মূর্ছা যায়? কে এ লোকটা? ওস্‌মানের খোস্‌ মেজাজের মাঝে আরেক জগৎসিংহ নাকি? না। সে জাতের নয়, সিংহজগতেরই না, বরং ঘোড়েলের মতই দেখতে। কিন্তু তাহলেও, আমার জীবনমরণ নির্ভর করছে যার ওপরে—সেই প্রশ্নোত্তরের মাঝখানে এক ভদ্র-লোককে রক্ষা করা ঠিক ভদ্রতারক্ষা বলে আমার বোধ হয় না।

'তুমি ডাক্তার গুহের সঙ্গে আলাপ করো।' এই বলে মীরা অন্তর্হিত হোলো।

'নমস্কার ডাক্তারবাবু,' আলাপের সূত্রপাত আমার···

'নমস্কার!' বলেই তিনি পকেট থেকে এক প্যাকেট বার করলেন—'দেখুন এগুলি ভালো করে! মোট বারোটি ছবি আছে—'

'দাঁড়ান মশাই, আগে বলুন এ-ছবি কেন?' আমি একটু আপত্তি করিঃ 'এর থেকে বেছেটেছে কি বেচতে চান আমাকে?···' বলে বলব কিনা ভাবি।···আর্টের ব্যাপারে আমি একেবারে আনাড়ি, তবে হ্যাঁ, মেয়েদের ছবি যদি হয়···কিন্তু

তাহলেও বলব, মেয়ের ছবির চেয়ে ছবির-মত-মেয়েই আমার বেশি পছন্দ···কিন্তু এই-ডাক্তার গুহর কাছে সেই গুহ্য কথাটা বেফাঁস করা কি উচিত হবে?

'ওহো! আপনি বুঝি আমাদের মনোবিকলন-সমিতির নাম শোনেন নি?'

'আজ্ঞে না।' অকপটে জানাই।

ভদ্রলোক আমাকে অনুকম্পার চক্ষে দেখেন, কিন্তু গলা দিয়ে তাঁর কোনো সহানুভূতির সুর গলে না। তিনি বলেন—'মনোবিকলন-সমিতি হচ্ছে এক মনোবৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান। আধুনিক মেয়েদের জন্যে আদর্শ স্বামী নির্বাচন করাই আমাদের কাজ। বিবাহ জিনিসটাকে তরুণতরুণীর খেয়াল-খুসির ওপরে ছেড়ে না দিয়ে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর খাড়া করার উদ্দেশ্যেই এই সমিতি। তুচ্ছ ভালোবাসার মোহে পড়ে বিয়ে না করে মেয়েরা যাতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে—'

'সোজা কথায় বৈজ্ঞানিক-বিবাহ, বুঝতে পারলাম।' আমি বলি—'বৈজ্ঞানিকদের বিয়ে করতে মেয়েদের সম্মত করা—এই তো?'

'মোটেই না! বৈজ্ঞানিক হলেই যে বিজ্ঞানসম্মত হবে তার কি কোনো মানে আছে? বৈজ্ঞানিককে বিবাহ নয়, বিবাহকে বৈজ্ঞানিক করা। সেজন্যে ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ নিয়ে স্বামীত্বের একটা মান আমরা বের করেছি। পাঁচ হাজার আদর্শ স্বামীকে এই ছবিগুলি দেখানো হয়েছিল, এগুলি দেখে তাদের যে মনোভাবের উদয় হয়েছে যথাযথ তা টুকে রাখা হয়েছিল—তারপর সেগুলির শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। এইভাবে, স্বামীত্বের আদর্শের একটা নিরিখ আমরা স্থির করতে পেরেছি বলে মনে করি।'

স্বামীত্বের আদর্শ ই তো আদর্শের SUMMIT—চূড়ান্ত লভ্য! সেই আদর্শ স্বামী এক আধটা না, দু'চার ডজন নয়—পাঁচ পাঁচ হাজার! এতগুলি পরমাশ্চর্য তিনি কোথায় কি ভাবে পেলেন জানবার লালসা হয়। কিন্তু আমার প্রশ্নমালা প্রকাশের আগেই তিনি তাঁর চিত্রশালা মেলে ধরেচেন।

'এইবার আপনি ব্যক্ত করুন আপনার মনোভাব।' এই বলে তিনি ছবির তাড়া আমাকে দিয়ে আরেক তাড়া দেন আমায়।

ছবিগুলির প্রতি এক পলক চোখ বুলিয়ে আমি বলি—'যখন অ্যাতো পীড়াপীড়ি করছেন, না বললে ছাড়বেন না কিছুতেই—তখন বলি। আমার মতে এগুলি এক আধপাগলার আঁকা।'
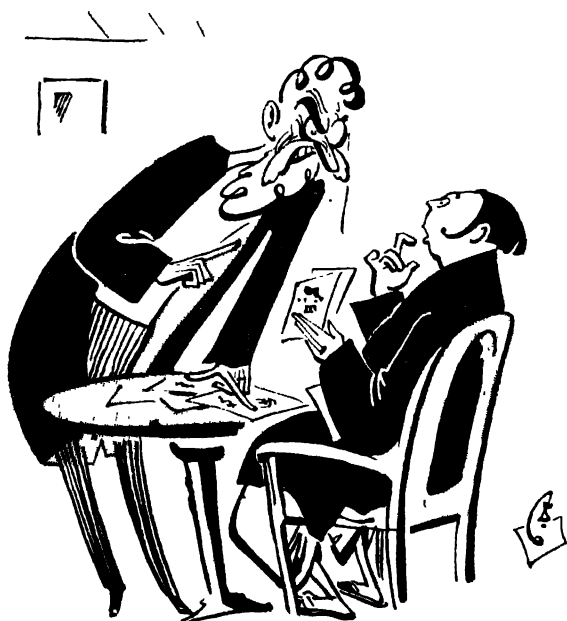
'তাহলে মশাই, আপনাকে বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি' বলতে গিয়ে তার মুখচোখ যে-দর্শন ধারণ করে তাকে আদর্শস্থল

বলা যায় কিনা সন্দেহ—'আর্টে আপনি নিরেট। এগুলি এঁকেছি আমি নিজে। এখন কাজের কথা। দয়া করে ছবি-গুলি দেখুন একে একে। দেখে দেখে আপনার মনের মধ্যে যা যা উদয় হয় সেসব ছবির পাশে পাশে লিখে যান। প্রত্যেক ছবির পাশাপাশি ফুট্‌কির লাইন রয়েছে, সেই ফুট্‌কিগুলির উপরে লিখুন। আপনাকে চল্লিশ মিনিট সময় দেওয়া হোলো।'

এই বলে তিনি নিজের হাতঘড়ির ওপর নজর রাখেন, ছবির দিকে আর দৃক্‌পাৎ করেন না।

চিত্রপঞ্জিটা হাতে নিই, পরীক্ষা সুরু হয়—আমার, আর ছবিদের। কিন্তু ওগুলি এতই বিচ্ছিরি যে হাতে নিতেই ইচ্ছে করে না। এমন কি, অতি আধুনিক ছবির চেয়েও মাথামুণ্ডুহীন।

তবে ভালো মন্দ দুই আছে। সবগুলো সমান নয়। যেমন চার নম্বরেরটা জলের মতন প্রাঞ্জল। কয়েকটি তরুণ-তরুণী ছোট্ট টেবিলের ধারে বসে পেয়ালা হাতে জটলা করছে।

'এই ছবিটি'—ছবির গায়ে ফুটকির ওপর আমার চুটকি লাগাইঃ 'হচ্ছে কফি হাউসের। গোটা হাউস নয়, তার একাংশ। ছেলেমেয়েগুলি ক্লাস পালিয়ে এসে ফুর্তি করছে এখানে। আদর্শ দম্পতি হবার কোনো দুরভিসন্ধি এদের মনে আছে কিনা আমি বলতে পারব না।' ঘোড়ার ছবির ধারে আমার টিপ্পনি-ঝাড়াঃ 'এই ঘোড়া ঘাস খায়।' বেড়ালের ঘাড়েঃ 'ইনি পাড়া বেড়াতে ওস্তাদ্‌। সবসময় লোকের পায়-পায় ঘরময় ঘুরঘুর করবেন। বিড়াল তপস্বী বলে বটে, কিন্তু উপাসনায় বসার মন নেই এদের। কুশাসন ওরফে কুশান্‌চেয়ার দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। বেড়ালদের দাম্পত্যজীবনের আদর্শ আমার জানা নেই।'

ছবি পরম্পরা আমার মনোভাব এই ভাবে ব্যক্ত করে তের

মিনিটেই বারোটা প্রশ্নের জবাব সেরে দিলাম। আর খুব যে খারাপ লিখেছি তা মনে হোলো না। সময়ের দিক দিয়ে হিসেব করলে সতের—সতের কেন, সাতাশ মিনিট বাঁচিয়েছি, ডাক্তার-মানুষের মেহনতী সময়ের এতখানি...কিন্তু কেন জানি না, মনস্তাত্বিকদের মনের তত্ত্ব কে জানে!—ওঁকে তেমন খুসি দেখা গেল না।

উত্তরপত্রের সঙ্গে তাঁর প্রশ্নবাণ তাঁকে ফেরৎ দিয়ে আমি উঠলাম—'কিছু মনে করবেন না। মীরার কাছে আমার একটু কাজ আছে, চল্লাম এখন।'

'না, এখন নয়। আপনার খাতা আমি পরীক্ষা করবার পর'—জানালেন ভদ্রলোক, বেশ একটু কড়াভাবেই—'তখন আমরা আপনাকে জানাবো। আমাদের মতামত চিঠিতেই জানবেন, খবর পাবেন তখন।'

'তার মানে?'

'তার মানে, আপনি মীরাদেবীর সঙ্গে বিবাহিত হবার উপযুক্ত কিনা আপনার উত্তরপত্র থেকেই তার বিচার হবে। আপনার খাতা দেখে তা আমরা ঠিক করবো। আর, জানাবো আপনাকে চিঠি দিয়ে। তবে একটা কথা জেনে রাখুন, মীরাদেবীও আমাদের সমিতির একজন। এবিষয়ে আমার মতই হচ্ছে তাঁর মত। যাক্, আমাদের মতামত জানতে পাবেন যথাসময়ে। এখন—আপনি আসতে পারেন। নমস্কার।'

এবার আমার মাথা ঘুরলো সত্যিই! টলতে টলতে সিঁড়ি উৎরে ফুটপাথে এলাম।...আ-ম-রা! আ-মা-দে-র মতামত! এরপর—এর ওপর আরো কী আছে কে জানে!

তারপর থেকে এক একটা মিনিট এক একদিনের মতই কাটতে থাকে। উত্তরপত্র পেশ করে উত্তরের পাত্র হয়ে

বসে আছি, কিন্তু পত্রোত্তর আর আসে না। অবশেষে, দীর্ঘ দু' শতাব্দী বাদে একখানা লেফাফা এলো আমার কাছে, ডাকযোগেই এলো। খামের ওপর লেখা—ডাক্তার বিরূপাক্ষ গুহের জাতীয় মনোবিকলন সমিতি। ভেতরে লেখা—

এই ব্যক্তির উত্তরপত্র পরীক্ষা করে জানা গেল, এঁর বুদ্ধি খুব উঁচুদরের নয়। বৈজ্ঞানিক কোনো বিষয়ে ধারণা করবার ক্ষমতাই নেই এঁর। দুর্বলমস্তিষ্ক, তার ওপরে মানসিক আলস্যে আরো কাহিল। সবকিছু চট্‌পট্‌ সেরে ফেলার দিকে ঝোঁক। যে কাজটা এক ঘণ্টায় করবার সেটা তের মিনিটে সারতে পারলে বাঁচেন। জীবনের গভীর বিষয়ের মহৎ বিষয়ের কিছুমাত্র বোধ শক্তি নেই। উঁচু দরের আর্ট বুঝতেও নারাজ। অকাতরে যামিনী রায়ের ছবি ফেলে হাল্‌কা নাচগানওয়ালা হিন্দি সিনেমার ছবি দেখতে ছুটবেন। আচার ব্যবহার নোংরা। বেড়াল যদি চেয়ারে বসে থাকে তাকে কষ্ট করে না হটিয়ে নিজেই বরং মাটিতে বসবেন। কিম্বা ঘুরে বেড়াবেন ঘরময়। তাছাড়া, কফিহাউসের দিকে খুব টান। তার থেকে আশঙ্কা হয় কালক্রমে কমিউনিস্টে দাঁড়াতে পারেন। আদর্শ হওয়া দূরে থাক, মোটামুটি চলনসই গোছের স্বামী হওয়াও এ-ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে—না। একদম্‌ না। অতএব এই বিবাহের প্রস্তাব নামঞ্জুর। ইতি, ডাঃ শ্রীবিরূপাক্ষ গুহ ও শ্রীমতী মারা দেবী।

ব্যস্‌, খতম্‌! আমারো খতম্‌ ঐ খৎ-এর সঙ্গেই। এখন কেবল লেকেই যাওয়া যায়, একলা—একেবারে ডুবতে। কিন্তু মুস্কিল, আমি আবার সাঁতার জানিনে। কৃশ্চান হলে কফিনে যেতাম।

অনেক ভেবে চিন্তে তার কাছাকাছি গেলাম। কফি হাউসে যাওয়া গেল—কফির পেয়ালায় নিজেকে ডোবাতেই।

নানুকে দেখা গেল সেখানে! একলা বসে এক টেবিলে। এখানে! একঘর মেয়ের মধ্যে নানু? কিন্তু নানুকে দেখলে আর কোনো মেয়েকেই চোখে পড়ে না। চোখে ধরে না।

বসলাম তার পাশে গিয়ে। —'কী খাচ্ছো?'

'আইস্ ক্রীম। কফি আইস্ ক্রীম।...খাবে?'

'খাওয়াতে পারো। বাধা নেই। কিন্তু—' ভগ্নকণ্ঠে বলি—'কিন্তু খেতে আমার আর রুচি হয় না।' দেড় মাইল লম্বা এক দীর্ঘনিশ্বাস বেরয় আমার।

'ফোঁস্ ফোঁস্ করছো যে! কী হয়েছে—কী?'

'কী আর হবে? কিছুই হয়নি। এজীবনে আর কী হবে? কিছুই হয় না আমার জীবনে...' বলে কথাটাকে আমি চাপা দিতে যাই: 'খাওয়াবে একটা আইস্ক্রীম আমায়?'

'স্বচ্ছন্দে।' ভালো করে তাকালো সে আমার দিকে। 'একি, তোমার গলা ভার—মুখ ভার-ভার। চোখ-মুখ অমন কেন?'

'এম্নিই।'

'না, না। কী হয়েছে, বলো না লক্ষ্মীটি।'

'কিছুই না। আরেকটি মেয়ে...একটু আগে...না, বলবার কিছুই নেই। তুমি যা করেছিলে সেও তাই করেছে! তোমার মতই প্রত্যাখ্যান করেছে আমায়।' ক্ষুণ্নকণ্ঠে জানাতে হয় আমাকে—'আগে তুমি ডোবালে। তারপর সে।'

'কী হয়েছে শুনি তো।' সে জানতে চায় তবুও।

কিছু না বলে সেই বিজ্ঞানসম্মত চিঠিখানা ওর হাতে তুলে দিই—'এই নাও। নিখিল ভারতীয় এই মনোবিকলন পড়ে

গ্যাখো। স্বামীহিসেবে আমি যে মোটেই টিকসই নই, ষ্ট্যাটিস্টিক্‌সই না,—এখানেই তার প্রমাণ। এই হতভাগা ডাক্তারটাই আমার সর্বনাশ করেছে।'

নানু পড়লো। পড়ে তাকালো আমার দিকে। আরেকবার তাকালো—আরো ভালো করে। চোখভরা বিস্ময় নিয়ে।

'সত্যি, তুমি কি আসলে এই? এই কি তোমার আসল চেহারা, মানে, এই কি তোমার মনের সত্যিকারের রূপ?' সে জিজ্ঞেস করে।

'কি করে বলবো? আমি কি নিজের কোনো তত্ব রাখি? নিজের বিষয়ে জানি কিছু? তবে বৈজ্ঞানিকের মত যখন এই, তখন···তখন হয়তো আমি এমনি অপদার্থই হবো।'

নানু গভীর নিশ্বাস ফ্যালে। 'তুমি কি বেড়ালকে চেয়ারে বসিয়ে নিজে ঘরময় ঘুরে বেড়াও? বেড়াতে পারো?'

'লোকটা ধরেচে ঠিক। বেড়ালকে হটানোর চেয়ে, আমার মতে, নিজেকে হাঁটানো ঢের সোজা। ঢের শ্রেয়ঃ। বেড়াল যদি নিজগুণে না নড়ে তাহলে কি করে তাকে সরানো যায় আমার জানা নেই।'

'আর, যামিনী রায়ের ছবির চেয়ে সস্তা নাচগানের ছবি তোমার বেশি পছন্দ?'

'একশোবার।'

'লক্ষ্মীটি,' নানুর স্বর কাঁপতে থাকে, 'তোমাকে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি আগে। ওপর ওপর তোমাকে জেনেছিলাম—সে জানা, তোমার কিছু না জেনেই। যাক্‌গে, সেকথা যেতে দাও। যেকথা আগে বলেছিলে, সেকথা কি আবার তুমি বলতে রাজী আছো আমায়?'

'নিশ্চয়।' আমি পুনশ্চ বলি: 'এক পেয়ালা আইস্‌ক্রিম খাওয়াবে তুমি আমাকে?'

'ওকথা নয়—বোকা কোথাকার!' ও বলে—'আহা! ওই কথাই কি আমি বলতে বলছি?'

'তার মানে?'—আমি টেবিল ছেড়ে লাফিয়ে উঠি: 'তার মানে তুমি—তুমি—তুমি—???'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ।'

তিনদিনের মধ্যে আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে—তিন আইনেই, ঠিক হোলো। আর, তারপর থেকে আমরা সুখেই থাকবো—বেশ আরামেই—বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও। আমার সেরা কুশন চেয়ারে ওর মিনি বেড়ালটা শুয়ে থাকবে।

আর অন্যটায় দুজনে আমরা ঘিঞ্জি হয়ে বসবো। নিয়মিত কফিহাউসে যাবো রোজ। আর, নাচগানের ছবি কলকাতায় এলে তো কথাই নেই, তার ত্রিসীমা ছাড়া কোথাও আমরা নেই—আর কোনোখানেই আমাদের পাওয়া যাবে না।

কফিহাউসে বসেই বিয়ের স্বপ্ন দেখি আমরা। আর, এই অঘটনের কথা ভাবি। মনস্তত্ত্ব বলে একটা জিনিস ছিলো বলেই না ভাগ্যিস্! মনের তত্ত্ব মেলে না নাকি, লোকে বলে! কিন্তু নাই মিলুক্, মনস্তাত্ত্বিকদের তো পাত্তা মেলে! তাদের একজনকে মাঝখানে পাওয়া গেল বলেই না আজ, নাকের বদলে নরুণ, মীরার বিনিময়ে এই miracle—নানুকে পেলাম।

মনোবিজ্ঞানের বিষয়ে যাই আপনারা বলুন, আমার মনে হয়, মনস্তত্ত্বের সমস্তই কিছু, ধর্মতত্ত্বের মত গুহায় (অথবা ডাঃ গুহের মধ্যে) নিহিত নেই। আর, মনোবিকলন জিনিষটা কখনো কখনো মনবিকল-করা হলেও তারও একটা বিহিত আছে।

সেরা চেয়ারটা পুষিকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে মনটা একটু উস্‌খুস্ করেই, কিন্তু বেদখলের এই দুঃখও পুষিয়ে যায়—ক্ষতিপূরণের দিকটা দেখলে। আরেকটায় তো আমরা নিবিড় হয়ে বসতে পারি, এক হতে পারি অবলীলায়; আর, খতিয়ে দেখলে একতার চেয়ে ঐকান্তিক কী আছে? মনের মতো মেয়ের মুখোমুখি বসে কথা কইবার মত আরাম যে নেই, তা জানি; কিন্তু তাতেও তো দ্বিধা থাকে, সন্দেহ থেকে যায়। তার চেয়েও আরাম সেই মুখরতা দূর করে'—আরো মুখোমুখি আসতে পারায়। মধ্যপদলোপী এক সমাসে সব দ্বন্দ্ব মিটে যায় তখন।. দুটি মুখ যখন একটি কথা বলে—এক কথাই মুখস্থ করে—একবাক্যে সায় দেয়......

'বিয়ের তো ঠিক হোলো,...' আমি এবার ইয়ের কথায় আসি—'কফি তো খেলাম, এখন একটু মিষ্টিমুখ করলে হয় না?'

'কফি হাউসে মিষ্টি কোথায় গো?'

'আহা, আমি কি সেই মিষ্টির কথা বলচি? ঝাল যেমন পরের মুখে খায়, তেম্‌নি যে-মিষ্টি পরের মুখেই খেতে হয়—'

'যাও।' মিষ্টিমুখ মুষ্টিভিক্ষাদানে বিমুখ।

'আমাকে না খাওয়াও, খাওয়াতে না চাও—তুমি খেলেও হবে। তাতেও আমার পেট ভরবে। তুমি খেলেই হবে আমার। তোমার খাওয়াতেই আমার খাওয়া।'

'কী যে বলো! কফি হাউসে—এই এত লোকের সামনে?'

'বেশ, একগাল মোটে! একগালের বেশি আমি চাইনে।' আমার সাধাসাধি। মুড়ির সাথে মুড়াক মিশিয়ে পেলে এক-গালেই মুখ ভরে, মন ভরাট্! আদরের এক পশ্‌লাতেই হৃদয়ের মরুভূমি উপ্‌চে ওঠে।—'একগাল পেলেই আমি খুসি।'

'না—না—না!'

কিন্তু আমার হাহাকার নান্নুর না-না-কার ছাপায়—'একগাল না পাই আধগাল...' কিন্তু হায়, এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে—যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে! জানি যে খাটালে বাড়ে—এম্‌নি বেড়ে জিনিস; দানের সাথেই আদান, আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে শোধ—একথাও মানি; তবু এও তো খাঁটি যে, এখানে কোনো জোর খাটে না কারো।

'একটানা চাইচি কি? তেমন একখানা চাইচে কে এখানে? একটান্ হলেই হয়...' হ্যাঁ, তাহলেই হয়। একটা সুখটানই খুব। মেজাজী মানুষের আমেজ আনতে তাই ঢের—তাই অঢেল, কিন্তু একটা না হলে কি হয়?

'একটা না দাও, আধখানা...একটুক্‌রো...বিন্দুমাত্র...পয়েণ্ট জিরো জিরো ওয়ান্...'

'ইস্! কী চুমুখোরের পাল্লায় পড়লাম!...এই নাও খাও।' তলানিওয়ালা ওর আইস্‌ক্রিমের পেয়ালাটা সে এগিয়ে দেয়—'এর মধ্যেই রয়েছে—হোমিওপ্যাথিক ডোজে।'

——❋——